জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

এক টাকা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত

- চিকিৎসক ও ভাস্কর
- অ্যান্টিবায়োটিক
- বিতর্ক-মঞ্চ ঃ হোমিওপ্যাথি
- বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক কোসম্বী
- ফিউশন রিয়্যাক্টর
- বিজ্ঞানাগারে স্বৈরতন্ত্র

পঞ্চম বর্ষ : চতুর্থ সংখ্যা

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী—১৯৮২

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সূচী—

সম্পাদকীয়		
চিকিৎসক ও ভাস্কর	—সঞ্জয় মিত্র	১
এন্টিবায়োটিকস : হাতিয়ার কি এখন বুমেরাং ?	—গৌতম ব্যানার্জী	৩
বিতর্ক মঞ্চ : হ্যানিম্যানের হোমিও-প্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ?	টি. আহমেদ, বিভাস নন্দী, হরিমোহন চৌধুরী, মণীন্দ্র-নারায়ণ মজুমদার	৫
দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী	—স্বপন সোম	১৫
স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারো	—রবীন মজুমদার	১৮
পরমাণু অস্ত্র-বিরোধী বিক্ষোভ, দেশে দেশে	—নিজস্ব প্রতিবেদক	১৯
মন্তব্য : গবেষণা-গবেষক-শিক্ষক	ঐ	১৯
জানবার কথা : ফিউশন রিয়্যাক্টর	—উদয়ন বসু	২০
রিপোর্ট : বসুবিজ্ঞান-মন্দির ও অন্যান্য		২১

প্রচ্ছদ : সৌমেন গুহ

যোগাযোগের ঠিকানা। (১) c/o ডি, এস. এন্টারপ্রাইজ, ৫২/৯/সি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ (প্রতি সোমবার সন্ধ্যায়) (২) ১, ডাঃ কার্তিক বসু ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৯ (প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়)

গ্রাহক চাঁদা (সডাক) বার্ষিক পাঁচ টাকা।

স্টলের কমিশন (১০ কপি বা ততোধিক) : ২৫%

সম্পাদকীয় । স্বৈরতন্ত্রের রাহুগ্রাসে বিজ্ঞান গবেষণা

পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ও নামকরা বিজ্ঞানাগারে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে স্বৈরতন্ত্রের কদর্য সরীসৃপ। খ্যাতনামা অধ্যাপকদের থেকে শুরু করে গবেষক-কর্মী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেশ কয়েকজনকে হুমকি দিয়ে অপমানজনক ভাষায় চিঠি দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির উচ্চতম প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত দুই ব্যক্তি। চিঠিগুলির প্রতি ছত্রে প্রকট হ'য়ে উঠেছে এক চূড়ান্ত ধরণের সংস্কৃতিরহিত আত্মম্ভরিতা, ক্ষমতালিপ্সা আর স্বৈরতন্ত্রের মানসিকতা। কয়েকটি চিঠিতে ঐ দুই ব্যক্তি এমন সব কথা লিখেছেন যাতে স্পষ্টতই তাঁরা অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হতে পারেন ও যাতে কতকগুলি ব্যাপারে তাঁদের নিজেদেরই দোষ প্রকারান্তরে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এতে তাঁদের ভ্রূক্ষেপ নেই, কারণ এদেশের আরো বহু বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানের মত এই প্রতিষ্ঠানটিতেও বলবৎ রয়েছে প্রশাসনের সঙ্গে বিজ্ঞানকর্মীদের সেই অপমানজনক 'প্রভু-ভৃত্য' সম্পর্ক যার দরুন বিজ্ঞানকর্মীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার অধিকার পান না, ও বঞ্চিত হন সংবিধানের 226 ধারার অধিকারগুলি থেকে।

এটিকে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার ব'লে ভাবা ঠিক হবে না। সারা দেশেই ক্রমশ আবার নতুন ক'রে প্রকাশ পাচ্ছে স্বৈরতন্ত্রের পরিচিত লক্ষণগুলি। এর সঙ্গে রয়েছে এ রাজ্যের বিশেষ একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এবং ঘটনাটির রাজনৈতিক মূল স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যখন কোন এক বিজ্ঞানকর্মীকে দেওয়া চিঠিতে কর্তৃপক্ষ নির্লজ্জের মত সদম্ভে ঘোষণা করে যে দেশের সব চাইতে ক্ষমতাশীল ব্যক্তিটির সমর্থন আছে তাদের এ কাজের পিছনে।

কদর্য প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপগুলির প্রায় সবকটিই অবশ্য মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। যদিও তাদের হটিয়ে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হাজার হাজার বছর ধ'রে কঠোর জীবনসংগ্রাম করতে হ'য়েছিল উন্নত প্রাণীগুলিকে।

দাম বাড়লো বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'র

লিউইস ক্যারলের 'আয়নার ভিতরে অ্যালিস'এর এক জায়গায় বিভ্রান্ত ছোট্ট মেয়ে অ্যালিস শুনতে পেল তাকে বলা হচ্ছে 'এখানে স্থির হয়ে থাকতে হ'লেও তোমাকে ছুটতে হবে জোর কদমে'। আমাদের এই আজব দেশেও অন্তত ছোট পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। কোনরকমে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হ'লেও তাদের পাল্লা দিতে হবে অসম্ভব দ্রুতগতিতে বেড়ে চলা কাগজের দাম আর অন্যান্য খরচপত্তরের সঙ্গে। আর পত্রিকার মান উঁচু করতে চাইলে ত' কথাই নেই। মুদ্রাস্ফীতি বা ইনফ্লেশন নাকি দুরকমের হতে পারে—'ডিমাণ্ড পুল' আর 'কস্ট পুশ'। আমাদের এই 'বি-ও-বি'র বেলায় দাম বাড়ার কারণ যে সম্পূর্ণভাবেই দ্বিতীয়টি তা বোধহয় না বললেও চলে। 'কস্ট' এর ধাক্কায় হয় মুখ থুবড়ে পড়া আর না হয় তো দাম বাড়ানো—এই দুটির মধ্যে বেছে নেওয়া গেল দ্বিতীয় বিকল্পটিকেই। পাঠকের প্রতিক্রিয়া অন্তত প্রতিকূল হবে না এটুকুই আশা।

চিকিৎসক ও ভাস্কর

'আজ এই 1981 সালেও কেন ক্রাচ ব্যবহার করেন বেশীর ভাগ পা-হীন মানুষ? পোলিও রোগীরা কেন ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেন তাঁদের দেহ? কেন বেড়ে যায় কুষ্ঠ রোগীদের দূষিত ঘা, ঠিকমত চিকিৎসায় যার বেশীর ভাগই সারানো যায়?' প্রশ্ন তুলেছেন ডাঃ পি. কে. শেঠী। ডাঃ শেঠী এক উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন অস্থি-শল্যচিকিৎসক। সার্জারিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী আছে। আর আছে লণ্ডনের এফ. আর. সি. এস। ১৯৫৯ সালে জয়পুরে পুনর্বাসন ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান হিসেবে এস. এম. এস. মেডিক্যাল কলেজ পঙ্গু হাসপাতালে নিযুক্ত হন। কিন্তু খুব শীঘ্রই ডাঃ শেঠী বুঝতে পারেন যে অধিকাংশ রোগী পশ্চিমী কায়দায় তৈরী কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে চান না, কারণ শুধু ব্যয়-বহুলই নয়, ভারতের পরিস্থিতির পক্ষে উপযুক্তও নয় এগুলি। বিশেষত গ্রামের গরীবদের ক্ষেত্রে, যারা কখনো চেয়ারে বসেনি বা বাঁধানো রাস্তায় জুতো পায়ে হাঁটেওনি। খাওয়া আর কাজের জন্য এরা পা আড়াআড়ি মুড়ে বসে আর বৃষ্টির সময় কাজ করে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে। যে সব পা-হীন মানুষ পশ্চিমী ধাঁচের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অনেককে আবার ক্রাচে ফিরে যেতে দেখা গেছে।

এসব দেখে ডাঃ শেঠী আর তাঁর সহকর্মীরা এক বিকল্প মডেলের পরিকল্পনা করলেন। আর এই মডেলের ডিজাইন উপস্থিত করলেন মেডিক্যাল টেকনিসিয়ানদের কাছে। তবে প্রথাগত বিদ্যা এই টেকনিসিয়ানদের সৃজনশীলতাকে এমনই আবদ্ধ করে রেখেছিল যে এই নূতন ডিজাইন কিভাবে কাজে লাগানো যাবে ভাবতেই তাঁরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

এই পরিস্থিতিতে মাষ্টার রাম চন্দ্র নামে কেন্দ্রটির এক শিল্প-শিক্ষক, কাঠ খোদাইকারী এক ভাস্কর, মনোনিবেশ করলেন বিষয়টিতে। প্রথমে ছাঁচ তৈরীর পুরনো পদ্ধতি প্রয়োগ করে তিনি তৈরী করলেন 'জয়পুরী পা'. যা তৈরী হচ্ছে এখনো অবধি। এইভাবে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত এক শল্য চিকিৎসক আর সনাতন পদ্ধতির কারিগরী জানা এক ভাস্করের যৌথ উদ্যোগ সৃষ্টি করলো এমন এক চমকপ্রদ কৃত্রিম প্রত্যঙ্গ যা কিনা স্বাভাবিক পায়ের পাতা থেকে প্রায় পৃথকই করা যায় না।

এই 'জয়পুরী পা' একটি সাধারণ কার্যকরী উপাদান দিয়ে তৈরী—স্পঞ্জ রাবার। উপরের অংশের জন্য হাল্কা, শক্ত এ্যালুমিনিয়াম শীট রেয়ন কার্ডে পুরোটা মুড়ে ব্যবহার করা হয় আর পায়ের পাতার উপরের অংশটা তৈরী হয় রোগীর চামড়ার রঙের সঙ্গে খাপ খাইয়ে ভালকানাইজ্‌ড রাবার দিয়ে। এটি তৈরীর মূল কৃতিত্ব এমন এক ব্যক্তির যিনি মোটর গাড়ীর টায়ার মেরামত করতেন আর অন্যদের শেখাতেন মেরামতের কাজ। শক্ত আর জলসহ হওয়ায় এতে জুতোর প্রয়োজন হয় না; এটির সঙ্গে চটিও ব্যবহার করা যায় আবার খালি পা-ও রাখা যায়। সব কয়টি উপাদান স্থানীয় ভাবে পাওয়া যায়। আর সস্তাও। নীচে এই কেন্দ্রে তৈরী আর পশ্চিমী কায়দায় তৈরী কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনামূলক দাম দেখানো হোল:

উৎপন্ন দ্রব্য	স্থানীয় মিস্ত্রী ও কারিগরের তৈরী	পশ্চিমী ডিজাইনে এ্যালিমকো কোম্পানীর শিক্ষিত কারিগরের তৈরী
জুতো	টাঃ 25·00 (কাঠের চটি)	টাঃ 65·00 (চামড়ার বুট)
হাঁটুর নীচের ক্যালিপার	„ 35·00	„ 190·00
হাঁটুর উপরের ক্যালিপার	„ 50·00	„ 380·00
পায়ের পাতার উপরের অংশ	„ 35.00	„100·00 (তথাকথিত স্যাচ ফুটের জন্য জুতো দরকার হয়ই)
হাঁটুর নীচের কৃত্রিম অঙ্গ	„ 135·00	টাঃ 480·00
হাঁটুর উপরের কৃত্রিম অঙ্গ	„ 250·00	„ 810·00

সারা দেশে খামারে জলে-কাদায় কাজ করছেন এমন তিন হাজারের ওপর পা-হীন মানুষ জয়পুরী পা ব্যবহার করছেন। এক নাগাড়ে 3,4 বছর ব্যবহারের পর মেরামতের জন্য আসতে হয়। কেন্দ্রটি বিস্তৃত হচ্ছে। 1975 সালে যেখানে 59 জন রোগী ছিলেন, 1980 সালে সেখানে রোগীর সংখ্যা ছিল 2,035।

গ্লাসগোতে স্কাথক্লাইড ল্যাবরেটরীতে গবেষণারত এক স্কটিশ পা-হীনকে পরীক্ষামূলকভাবে এই পা পড়তে দেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষার শেষে তিনি এটা আর ছাড়তে চাইলেন না, কারণ রুক্ষ স্কটিশ উচ্চভূমিতে হাঁটাচলার পক্ষে এটি অত্যন্ত উপযোগী।

কেন্দ্রটি কয়েকটি সাদামাটা ঘর নিয়ে তৈরী একটি ছোট গ্রামের মতো দেখতে। বন্ধু বা পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে বা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বেশী রোগী এসে পড়লে তাঁদের জন্য চালার তলায় বিছানার ব্যবস্থা করা হয়; কাউকেই ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। পুরুষরা থাকেন কেন্দ্রের ভিতর। মেয়েদের জন্য কাছেই একটা পাকা বাড়ী আছে। এঁরা আসেন ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান সব জায়গা থেকেই। আসেন প্রায়ই বহু বছর অঙ্গহীন অবস্থায় থাকার পরও। বাগানে স্নান ধোওয়া-মোছার জায়গা আছে। রোগীরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য যাতে সব্জি ফলাতে পারেন তার জন্য একটি সব্জি বাগানেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে।

রোগী পৌছনোমাত্র তাঁকে তাঁর থালাবাসন, তোয়ালে আর সাবান দিয়ে দেওয়া হয়। আর একটা পোস্ট কার্ড দেওয়া হয় বাড়ীতে জানিয়ে দিতে যে ঠিকমত এসে পৌছেছেন তিনি। এটা করা হয় এখানে থাকা কালীন তাঁকে লেখা পড়া শিখতে উৎসাহিত করার জন্য। নূতন অঙ্গটি তৈরী হয়ে ব্যবহারযোগ্য হ'তে যে ছয় সপ্তাহ মত সময় লাগে তার মধ্যেই শেষ হয় লিখতে আর পড়তে শেখা। প্রতিদিন সকালে সব রকম বয়সের ছাত্রদেরকে নিয়ে এক কোণায় শিক্ষকরা বসে যান পড়াতে। অঙ্কও শেখানো হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা রান্না করেন। এক সমাজসেবক একটি পাঠাগার চালান আর রোগীদের ইতিহাস লিখে রাখেন।

1965 সাল থেকে কেন্দ্রটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরী করছে নিজেদেরই কারখানায়। একটি বৈদ্যুতিক করাত আর কিছু ড্রিল ছাড়া দামী যন্ত্রপাতি বলতে প্রায় কিছুই নেই এই কারখানায়। কারিগরদের মধ্যে আছেন চর্মশিল্পী, সূত্রকর, ভাস্কর, রত্নশিল্পী আর রাস্তার শ্রমিক বেদেরা। পরিদর্শনকারী সার্জনরা দেখে অবাক হয়ে যান যে পা-হীনেরা কৃত্রিম পা লাগানোর পর 45 মিনিটের মধ্যেই হাঁটতে পারেন। ডাঃ শেঠী বলেন যে পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা সমাজের প্রধান ধারা থেকে বিজ্ঞানীদের দূরে সরিয়ে দেয়। বেশি উপার্জনের আশায় এঁরা সাধারণত শহরের বড় বড় হাসপাতালের কাজ করতে চান গ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দিকে না তাকিয়ে। অথচ এখানেই এঁদের প্রয়োজনটা সবচেয়ে বেশী। গ্রামের লোকেরা আত্মীয়স্বজন ছেড়ে বেশীদূর যেতেও চান না, আর যাওয়ার সঙ্গতিও নেই তাঁদের।

ডাঃ শেঠী বলেন, "আমাদের দক্ষ লোকের অভাব নেই। কিন্তু এঁরা উপকারে আসেন কেবল ধনীদের। অথচ এঁদের চেষ্টায় প্রচুর সাহায্য হতে পারে প্রতিবন্ধীদের।" 1975 সালে কৃতজ্ঞ কিছু রোগী আর কিছু দরদী সমর্থক মিলে মহাবীর সোসাইটি নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থার সাহায্য ছাড়া কেন্দ্রের কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হোত। এখন কেন্দ্র সাহায্য পাচ্ছে রাজস্থান সরকারের কাছ থেকে।

উৎসাহজনক পরিবেশ সৃজনশীলতার জন্ম দেয়। এখানে কর্মরত একজন প্লাম্বার মাত্র আটশো টাকায় একটি চাকা লাগানো চেয়ার তৈরী করেছেন। ইনি এ্যালিমকো স্টেট কর্পোরেশনের তৈরী 1,500 টাকা দামের হুইল চেয়ারে একটি খুঁৎ লক্ষ্য করেন যাতে কিনা চেয়ারটি দু তিন বছরেই ভেঙ্গে যাবে। প্রথাগত শিক্ষার অভাব, যা নিরক্ষর; অশিক্ষিত মিস্ত্রী আর কারিগরদের সরকারী হাসপাতালে চাকরী পাওয়ায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা এখানে কোন প্রতিবন্ধকই নয়। তবে এঁরা এখানে বেতন পান কম। এখন প্রচেষ্টা চলেছে এঁদের মাইনে কিছুটা বাড়ানোর।

আমি যেবার কেন্দ্রটি দেখতে যাই সেবার এক পা হীন ব্যক্তিকে দেখেছিলাম কৃত্রিম পা পড়ে আর এক জনকে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছেন। পা দুটি পড়ে অনায়াসে দৌড়াচ্ছিলেন তিনি। আর একজন পা-হীন মানুষ সাইকেল চালাচ্ছিলেন, গাছে উঠছিলেন, দুই মিটার উঁচু থেকে মাটিতে ঝাঁপ দিচ্ছিলেন। কেন্দ্রের মূলমন্ত্র হল ভগবদ্গীতার বাণী 'পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি', অর্থাৎ পঙ্গুও পাহাড় ডিঙ্গোতে পারে। চারজন প্রাক্তন রোগী কেন্দ্রে কাজ করার জন্য এখানেই থেকে গেছেন। এঁদের একজন আবার বিয়ে করলেন আমি যাওয়ার সপ্তাহখানেক আগে। নতুন সম্ভাবনায় ভরা জীবন ফিরে পাচ্ছেন রোগীরা এই কেন্দ্র থেকে।

একটি ভারতীয় পুরস্কার ছাড়াও ডাঃ শেঠীকে সম্প্রতি ফিলিপিনসের ম্যাগসেসে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। "কারিগরি আর প্রযুক্তি বিদ্যাকে যে কুয়াশায় ঢেকে রাখা হয়, তার আবরণ খুলে দেওয়াই আমাদের সাফল্যের চাবিকাঠি," বলেন ডাঃ শেঠী।

পশ্চিমী 'সাহায্য' আর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে এই দৃষ্টিভঙ্গী যে অত্যন্ত উপযোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সঞ্জয় মিত্র

Neo Tele-Tronix Private Limited

Office : 256/3 P. N. Mitra Lane Calcutta-53

Works : 6/7 Bejoygarh. JADAVPUR
Calcutta-32 Phone : 72-1133

We manufacture :

HIGH VOLTAGE Transformers including RESIN casted H. V. Transformers, Breakdown testers such as OIL TESTING SET, Testing sets for Gloves, Bushing, Rubber Mat, Varnish, Cable etc.

HIGH VOLTAGE A. C. & D. C. POWER SUPPLIES for Laboratories, CHOKES,

Different Electronic Control Equipments.

এণ্টিবায়োটিক্স : হাতিয়ার কি এখন বুমেরাং ?

(সায়েন্স টু—ডে, সেপ্টেম্বর ১৯৮১ অবলম্বনে রচিত)

১৯২৮ সালে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কর্তৃক কিছুটা আকস্মিকভাবে ছত্রাক থেকে নিস্থঃরিত জীবাণুনাশক পদার্থের আবিষ্কারের পর ১৯৪০ সালে পেনিসিলিনকে সর্বপ্রথম এমন একটি জীবাণুনাষক পদার্থ হিসাবে ঘোষণা করা হয় যা কি না শুধুমাত্র আক্রমণকারী জীবাণুদেরই ধ্বংস করে কিন্তু আক্রান্ত পশু বা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। সেই থেকে শুরু হলো এন্টিবায়োটিক্সের যুগ এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়। প্রচুর গবেষণার ফলে প্রস্তুত হলো আরও অনেক এন্টিবায়োটিক্স যার ফলে আজ রক্ষা পাচ্ছে বহু মানুষের প্রাণ। চিকিৎসাকার্যের প্রতি পদক্ষেপে এন্টিবায়োটিক্স একটি অব্যর্থ হাতিয়ার হিসাবে গণ্য এবং এর চাহিদা ক্রমবর্ধমান। কাজেই, ব্যবসায়ীদের কাছে এটি একটি উর্বর ক্ষেত্র। দেশীয় এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রায় সবদেশেই উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে প্রতিযোগিতা করে এন্টিবায়োটিক্সের যোগান দিয়ে যাচ্ছে। এরা মুনাফা-লাভের স্রোত ঠিক রাখার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে ও চিকিৎসাজগতে এন্টিবায়োটিক্সের নির্বিচার প্রয়োগের অনুকূলে বাতাবরণ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

ঘটনা যখন এরকম চলছে তখন কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য এন্টি-বায়োটিক্সের সফলতার সোনালী দিকগুলিতে কালো মেঘের ছায়াপাত করেছে যা প্রথম প্রথম এড়ানো সম্ভব হলেও এখন আর এড়ানো যাচ্ছে না। প্রাকৃতিক কোন উপাদান নির্বিচারে ভোগ বা অতি ব্যবহার করলে তার ফল কি হয় বিজ্ঞানীরা তা শক্তি সমস্যা এবং ecological balance রক্ষার ক্ষেত্রে দেখেছেন। এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি গুরুতরভাবে দেখা দিলো তা হলো কিছু কিছু জীবাণুর এন্টিবায়োটিক্স প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন। প্রথমে ভাবা হয়েছিলো এই বিশেষ ক্ষমতা অর্জনের কারণ মিউটেশান। পরে দেখা গেলো যে মিউটেশান ছাড়াও প্রকৃতিতেই জীবাণুদের কিছু উপাদানের মাধ্যমে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। এই উপাদনগুলিকে বলা হয় R-factors বা Resistance factors। প্রধানতঃ এরই সাহায্যে জীবাণুরা এন্টিবায়োটিক্সের প্রভাব এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে এবং কালক্রমে প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন জীবাণুগুলি এণ্টিবায়োটিক্সের প্রভাবে মরে গেলে এরাই প্রাধান্য বিস্তার করে। ১৯৫৫ সালে একজন জাপানী মহিলা এক বিশেষ ধরণের সিগেলা জাতীয় ব্যকটোরিয়া (Shigella dysentriae যা আমাশয় রোগের সৃষ্টি করে) দ্বারা আক্রান্ত হন যাদের Chloramphenicol, Streptomycin, Tetracycline ও Sulphonamide জাতীয় এণ্টিবায়োটিক্স বা ঔষধ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় নি। পরে দেখা গেলো যে ঐ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে একাধিক জীবাণুনাষককে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা সম্পন্ন (Multiple drug resistance) R-factor রয়েছে। পরবর্তীকালের গবেষণায় আরও বহু জীবাণুর মধ্যে যেমন, E. coli, Salmonella klebsiellae, Staphylococci প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়ায় R-factor পাওয়া গিয়েছে। মুশকিল হলো যে এদের মধ্যে অনেক ব্যাকটেরিয়ার আস্তানা আছে আমাদের খাদ্যনালীর মধ্যে। এই সহবস্থান উপকারী কেননা এই জীবাণুগুলি খাদ্যনালীতে কিছু এনজাইম ও ভিটামিন নির্গত করে আমাদের পুষ্টিতে সাহায্য করে; কিন্তু এদের মধ্যে যদি R-factor থাকে এবং সেই R-factor যদি আক্রমণকারী কোন নতুন ব্যকটেরিয়ায় স্থানান্তরিত হয় তবে এণ্টিবায়োটিক প্রয়োগে আক্রামণকারীকে মেরে ফেলা যাবে না। এর ফল সহজেই অনুমেয়!

R-factor গুলি হলো ছোট ছোট DNA অনু যারা জীবাণু-কোষের মধ্যে নিজে নিজে বংশ বিস্তার করার, এক জীবাণু থেকে অন্য জীবণুতে স্থানান্তরিত হওয়ার এবং ঔষধ-প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখে। আসলে R-factor DNA তে কতকগুলি জিন আছে যার থেকে প্রোটিন বা এনজাইম তৈরী হয়। এই এনজাইমগুলি এক বা একাধিক এণ্টিবায়োটিক্স বা ঔষধের সাথে বিক্রিয়া করে এদের কার্যকারীতা নষ্ট করে দেয়। ফলে যে জীবাণুতে R-factor আছে সেগুলি এমন কি একই সাথে একাধিক জীবাণুনাষক ঔষধের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। এই R-factor প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন অন্য জীবাণুতে স্থানান্তরিত হলে জীবাণুটি এই ক্ষমতা অর্জন করে।

১৯৭২ সালে কেরালার কালিকটে R-factor বহন করা টাইফয়েড রোগ সৃষ্টিকারী এক বিশেষ ধরণের Salmonella ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় যা আমাদের খাদ্যনালীতে থাকে না। অতঃপর মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা ও চণ্ডীগড় প্রভৃতি জায়গার হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে বহু E-coli এবং Salmonella জাতীয় ব্যাকটেরিয়া পাওয়া গিয়েছে, যাদের মধ্যে R-factor রয়েছে। শহরে হাসপাতাল ছাড়াও কিছু কিছু প্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে এণ্টিবায়োটিক্সের ব্যবহার কম হয়েছে এমন সব অঞ্চলে R-factor বহনকারী ব্যকটেরিয়ার প্রাদুর্ভাব কম।

এটা অনুমান করা হচ্ছে যে, যে-সব স্থানে নির্বিচারে এণ্টিবায়োটিক্সের ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন ব্যাকটেরিয়ার বিনিময়ে R-factor বহনকারী ব্যাকটেরিয়ার প্রাধান্য বিস্তারে সাহায্য করা হয়েছে। ঠিক এটাই আমাদের বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ।

কিছুটা ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রচার এবং প্ররোচনায় ও কিছুটা রোগীদের কাছে ম্যাজিকের মতো রোগ সরিয়ে জনপ্রিয় হয়ে থাকার ইচ্ছায় (যেটা আবার রোজগারের সাথে সম্পর্কযুক্ত) চিকিৎসকেরা এই বিধান মেনে নিয়েছেন যে যখন সরাসরি এবং পরিস্কারভাবে কোন লক্ষণ ধরা বা বোঝা যাচ্ছে না তখন এন্টিবায়োটিক্স লাগাও। এর ফলে অর্থহীন ভাবে নির্বিচারে এণ্টিবায়োটিকসের ব্যবহার হচ্ছে। ভারতে এবিষয়ে কোন সমীক্ষা হয়নি। কিন্তু আমেরিকায় কয়েকটী সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে এণ্টিবায়োটীকস দেওয়া হয়েছে এমন সব প্রেসক্রিপসানের শতকরা ৫০-এর অধিক ক্ষেত্রে কোনরকম জীবাণুদ্বারা আক্রমণের সাক্ষ্য নেই এবং ৮০-৯০ ক্ষেত্রে এণ্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপসান অপ্রয়োজনীয়। অধিকাংশ পেটের অসুখে গ্লুকোজ, লবণজল, বাইকার্বনেট সেবনেই কাজ হয় এবং ধীরে ধীরে সেরে যায়। কিন্তু আমরা আতংকিত হয়ে ডাক্তারের কাছে গেলে প্রায়শই শক্তিশালী এণ্টিবায়োটিকস পরামর্শ দেওয়া হয়। এইসব অপ্রয়োজনীয় এণ্টিবায়োটিকস বেশী পরিমানে শরীরে গ্রহণ করলে কয়েকটী উপদ্রব দেখা দিতে পারে। এণ্টিবায়োটিকসগুলি সরাসরি রোগীর শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। যেমন (১) এণ্টিবায়োটিকসের প্রভাবে খাদ্যনালীর উপকারী ব্যকটিরিয়া মরে গেলে ফাংগাস ও ইষ্টের আক্রমণের সুবিধা হয় এবং এর ফলে নতুন উপসর্গ দেখা দেয়। (২) পেনিসিলিন জাতীয় ঔষধে হিমগ্লোবিন কমে গিয়ে Hemolytic anemia হতে পারে (৩) Chloramphenicol জাতীয় ঔষধ রক্তের লোহিত কণিকা তৈরীতে বাধা দেয়। (৪) অতিরিক্ত Erythromycin সেবনে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যেকার অংশটী শুকিয়ে Obstruction হয় এবং তলপেটে ব্যথা হয়। (৫) এছাড়া টেট্রাসাইক্লিন জাতীয় Broad Spectrum antibiotics অতিরিক্ত সেবনে দাঁত, কান ও কিডনীর কার্যক্ষমতা নষ্ট করে ও চর্মক্ষতের সৃষ্টি করে।

জনজীবনে এণ্টিবায়োটিকসের অপব্যবহারের এতসব কুফল সম্পর্কে সচেতন থেকে চিকিৎসক সমাজ যদি এর প্রতিকারে সচেষ্ট না থাকেন তাহলে ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি মুনাফার লোভে এই নিশ্চেষ্টতার সুযোগ নেবে নানা বিচিত্রপথে। বিভিন্ন প্রস্তুতকারী সংস্থা দুটী বা তিনটি এণ্টিবায়োটিকসের মিশ্রণে ফরমুলা তৈরী করে বিক্রি করছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ফরমুলা অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন। যেমন, পেনিসিলিন + স্ট্রেপটোমাইসিন বা এম্পিসিলিন + জেন্টামাইসিন এই ধরণের মিশ্রণ কার্যকরী কিন্তু পেনিসিলিন + টেট্রাসাইক্লিন, কেনামাইসিন + জেন্টামাইসিন ক্ষতিকর। এগুলি শুধু সংস্থার প্রস্তুত ঔষধগুলি বাজারে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে কিন্তু রোগীকে সাহায্য করে না বরং side effects থেকে ভোগায়। প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি আজকাল তাদের ঔষধের গায়ে বিস্তৃত তথ্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোন কোন ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাচ্ছে। তার বদলে কিছু সংক্ষিপ্ত এবং সুবিধাজনক বিবরণী বটিকার মতো প্রচার করা হচ্ছে। চিকিৎসক তথা জনসাধারণের জানা দরকার যে ঐসব বিবরণীতে ঔষধের অনুকূলে এমন সব তথ্যের উল্লেখ থাকে যার বিপরীত তথ্যও বৈজ্ঞানিক জার্ণালে পাওয়া যেতে পারে অথচ সেগুলি সুবিধাজনক-ভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসকেরা প্রেসক্রিপসনে এণ্টিবায়োটিকের নাম লেখার আগে ভাল করে ভেবে দেখবেন যে [১] রোগীর দেহে বিশেষ কোন জীবাণুর আক্রমণ হয়েছে তা পরীক্ষা দ্বারা সঠিক-ভাবে প্রমাণিত কিনা, [২] যে এণ্টিবায়োটিকের কথা ভাবা হচ্ছে তার কার্যকারীতা উক্ত জীবাণুর উপর আছে কিনা এবং [৩] অতিরিক্ত পরিমাণ এবং অপ্রয়োজনীয় কোন এণ্টিবায়োটিক একই সাথে দেওয়া হচ্ছে কিনা। এই ধরণের সতর্কতা অবলম্বন Medical ethics এর মধ্যে পড়ে।

এখানে সরকারের দায়িত্বের কথা এসে পড়ে। ঔষধের বাজারে সরকারের উপস্থিতি ও নিয়ন্ত্রণ নামমাত্র। বহুজাতিক সংস্থাগুলি দায়িত্বহীন ভাবে বাজারে ঔষধ ও মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা করছে, যা কিনা তারা উন্নত দেশে করার সুযোগ পায় না। সঠিক তথ্য পরিবেশন ও জনস্বার্থে ঔষধের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ক'রে ঔষধের অপব্যবহার বন্ধ করা দরকার। সেই সাথে চিকিৎসক সমাজের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্য এবং নিজেদের অজ্ঞতা দূর করার জন্য জনসাধারণের সচেষ্ট থাকা প্ররোজন।

গৌতম ব্যানার্জী

With best compliments of :

Electro Scientific Concern

154, LENIN SARANI, CALCUTTA-700 13

Dealers in SYSTRONICS Make & RADART make instrument like CRO
L.C R. Bridge, A.F.G., Function Generator, Digital pH meter
Digital Flame Photometer etc.
Sole selling agent for HIL make Multimeter.

Stocklsts of Automatic Electric Ltd. Products dealing with
I. C. Transistors etc.

বিতর্ক মঞ্চ ঃ হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ?

[বি-ও-বি'র জুলাই-আগস্ট ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ?' প্রবন্ধের জবাবে কয়েকটি চিঠি এসেছে আমাদের দপ্তরে। এছাড়া বহুসংখ্যক পাঠক মৌখিকভাবে প্রবন্ধটির বক্তব্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে (বেশির ভাগই বিপক্ষে) মন্তব্য করেছেন। আমরা চিঠিগুলির বক্তব্য প্রকাশ করছি এই বিতর্ক মঞ্চে। শিরোনামগুলি আমাদের দেওয়া। আর তার সঙ্গে রাখছি মূল প্রবন্ধ লেখকের প্রত্যুত্তর। জুলাই-আগস্ট সংখ্যার প্রবন্ধটি ছিল মূল রচনার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য। ফলে বাদ পড়ে গিয়েছিল প্রয়োজনীয় কিছু বক্তব্য। তাই আরেকটু বিশদে বক্তব্য রেখেছেন লেখক এই সংখ্যায়। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আর কোন লেখা বা চিঠি যদি কেউ দিতে চান তবে অনুরোধ রইল, যে বক্তব্যগুলি এখানে বলা হয়ে গেছে তার যেন পুনরাবৃত্তি না করেন।

সঃ মঃ, বি-ও-বি।]

কারণ না জানলে কি ঘটনা মিথ্যা হয়ে যায় ?

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় "হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত ?" লেখাটি প'ড়লাম। লেখকদের মন্তব্যে এক জায়গায় দেখলাম 'চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতার ফলেই মানুষের হোমিও প্রীতি ঘুচছে না।' স্বভাবতাই মনে হয় লেখকদ্বয়ের হোমিওপ্যাথির প্রতি মোটেই আস্থা নেই। হোমিওপ্যাথিতে ফল পাওয়ার ব্যাপারে বলা হয়েছে, ওষুধে সারে না, সারে আপনা আপনি, প্রাকৃতিক নিয়মে অথবা রোগীর মনের বিশ্বাসে।

আমার প্রশ্ন, যে শিশুর মন এখনও গড়ে ওঠেনি, যে তার রোগ সম্পর্কে কিছুই জানেনা—তার যখন অসুখ সারে, সেটি তখন কিভাবে সারে ? তার পিতামাতার মনের বিশ্বাসে কি ?

সর্পাতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা বিরল নয়। বিষহীন সাপের দংশনে অনেক জনকেই মৃত্যুর বুকে ঢলে পড়তে হয়েছে। একটি বিষহীন সাপের দংশনে একটা মানুষের মৃত্যু নিশ্চয়ই অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার—কিন্তু মৃত্যুটাতো সত্য—এই সত্য মৃত্যুর সত্য কারণতো একটা আছে। সর্পদংশনটা সত্য কারণ না হলেও সত্য কারণটা তো সর্পদংশন উদ্ভূত। অতএব সর্পদংশনের সাথে মৃত্যুর একটা সম্পর্ক তো নিশ্চয়ই আছে। সম্পর্কটা খুঁজে পাইনি বলে ঘটনাটাকে তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হোমিও ওষুধের বিশুদ্ধতা বা গুণমান পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয়নি বলে ওষুধের ফলটাকে তো উপেক্ষা করা যায় না। ঘটনাতো একটা ঘটেনি, ঘটনা অনেকই ঘটে। ঘটনাই অনুসন্ধিৎসু মনকে টেনে নিয়ে যায় ঘটনার কারণ জানতে, সৃষ্টি হয় বিজ্ঞান। ঘটনাই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সৃষ্টির মূল কারণ। তাই হোমিও ওষুধ ব্যবহারে ঘটনা যখন ঘটে কারণ নিশ্চয়ই আছে, আমরা কারণ জানতে ব্যর্থ, আর আমাদের ব্যর্থতা তো জনকল্যানকামী, আশাবাদী বিজ্ঞানকে নিরাশার অমানিশাসম অন্ধকারে নিক্ষেপ করতে পারেনা। নিজেদের অক্ষমতাকে ঢাকতে গিয়ে কোন ঘটনা অবৈজ্ঞানিক একথা বলা চলে না। যদি কেউ এ কথা বিশ্বাস করেন তাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি না ঘটে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতায় আসে চরম আঘাত।

লেখকেরা নিজেরাই বিশ্বাস করেন মনের কথা, তাই মনের বিশ্বাসে অসুখ সারে একথা তাঁরা লিখেছেন—কিন্তু মনেরও তো কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। তবে তার প্রভাবে কিভাবে অসুখ সারতে পারে ?

যাই হোক ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল লেখকদের কথা মত উঠে না গিয়ে কাউন্সিলের বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার মানবদরদী প্রচেষ্টায় উন্মুক্ত হোক নিরাময়ের হোমিও সংস্করণের একটা দিক।

টি. আহমেদ

বিড়লা ইনডাস্টিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়াম।

'আংশিক সত্য মিথ্যার চেয়েও জঘন্য'

হ্যানিম্যানের হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞানসম্মত? শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানকর্মী শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও শ্রীদীপাঞ্জন রায়চৌধুরী* মহাশয়দ্বয়ের মনে প্রশ্ন জেগেছে। বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা নিঃসন্দেহে ভাল। তবে যেহেতু বিষয়টা বিজ্ঞান-বিষয়ক—আংশিক সত্য, আংশিক তথ্য, আংশিক তত্ত্ব মূল্যবান প্রবন্ধটিকে অবমূল্যায়িত করেছে। 'আংশিক সত্য মিথ্যার থেকেও জঘন্য।' তাই প্রবন্ধকারদের আরো সতর্কতার সঙ্গে বিজ্ঞান মানসিকতা বজায় রাখার দিকে নজর দিলে ভাল হতো। ডাঃ হ্যানিম্যান সংস্কারমুক্ত পর্যবেক্ষক হতে বলেছেন।

প্রবন্ধকারেরা এগারোটা সূত্র-সঙ্কেত দিয়েছেন। এছাড়া অনেক মূল্যবান গ্রন্থও তাঁদের সাহায্য করেছে। সূত্র-সঙ্কেতের মধ্যেও যে গ্রন্থগুলির উল্লেখ আছে সেগুলিকেও পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি বলে মনে হয়। কতকগুলি মনগড়া, কতকগুলি ভাসাভাসা তত্ত্বের ভিত্তিতে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে পুরোপুরি না বুঝে বিজ্ঞানভিত্তিক রচনা লেখা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। এই প্রবন্ধের প্রতিটি পয়েন্টের উত্তর দিতে গেলে এই প্রতিবাদপত্রের যা কলেবর দাঁড়াবে এক বছরের সব কয়টা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মীতে তা প্রকাশের জায়গা হবে না। কারণ পল্লবগ্রাহী উদাহরণ অনেক উল্লেখ করেছেন প্রবন্ধকারেরা।

১। এলোপ্যাথি ও এন্টিপ্যাথিতে গোলমাল করে ফেলেছেন।

২। 'এই সব পরীক্ষা থেকে তিনি ধারণা করেন (১৭৯৬) যে ওষুধে সুস্থ শরীরে কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই ওষুধই ঐ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে।'

'প্রতিষেধক হিসাবে কাজ' করতে পারে বটে কিন্তু হোমিওপ্যাথির মূল নিয়মে আরোগ্যের কথা বলা হয়েছে, প্রতিষেধকের কথা নয়। তাও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, বলা হয়েছে আংশিকভাবে।

Spiritual life force প্রসঙ্গে বলা যায়—**Concept of vital force** বা জীবনীশক্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁরা আরেকটু গভীরে গেলে **vital force, vital principle** ইত্যাদি সম্বন্ধেও ধারণা হোতো কিছুটা, যা বোঝার প্রয়োজন আছে। (অবশ্য এই বিশেষ কয়েকটা শব্দ) (**word**) সম্বন্ধে বর্তমানের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন)।

৪। পুরানো রোগের আট ভাগের সাত ভাগ-ই খোস পাঁচড়ার রকমফের, **'variation of psora'**, অর্গানন এবং ক্রনিক ডিজিজে উল্লিখিত এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে **psora** এবং খোস পাঁচড়াকে একাকার করে ফেলেছেন। **psora** খোস পাঁচড়া নয়; আবার খোস পাঁচড়াও সোরা নয়। **Miasm** সম্পর্কে ধারণার প্রয়োজন।

৫। 'হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করে তিনি জীবনে প্রচুর উপার্জন করেছিলেন'। যে দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রবন্ধকারেরা জীবনের শেষ কয়েক বছরের উপার্জন দেখেছেন, সারা জীবনের সাতটি দশকের নিদারুণ অর্থকষ্ট, অনাহার অর্ধাহার, অত্যাচারে জর্জরিত হওয়া, ২৬ বার গৃহহারা হওয়া, আপোষহীন সংগ্রাম কিছুই দেখেন নি, সেই দৃষ্টিভঙ্গীতেই প্রবন্ধটা আগাগোড়া রচিত। বিজ্ঞানী হ্যানিম্যান, রসায়নবিদ হ্যানিম্যান, বহু ভাষাবিদ হ্যানিম্যান, সত্যনিষ্ঠ হ্যানিম্যান, সর্বোপরি দরদী নিরহঙ্কারী হ্যানিম্যানের মূল্যায়নের কোনো চেষ্টাই করা হয়নি। রচনাটা কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? (উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে অনেক রচনা-ই হোমিওপ্যাথির জন্মলগ্ন থেকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে)। অথবা হোমিওপ্যাথি ও হ্যানিম্যানকে হেয় প্রতিপন্ন করার মানসিকতা থেকে এ প্রবন্ধের সৃষ্টি?

৬। 'হোমিওপ্যাথির মূল দৃষ্টিকোণ অভিজ্ঞতাবাদের—**(Empirical)**' এ জ্ঞানটা লেখকদের হোল কি করে? এটা একেবারে ভুল। ডাঃ হ্যানিম্যানের রচনা যদি পড়া থাকতো তাহলে তাঁরা দেখতেন, তিনি অভিজ্ঞতাকে, বিশ্বাসকে, এমন কি পূর্বনির্ধারিত ধারণাকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। তিনি ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারে বারংবার পরীক্ষা প্রতিপরীক্ষা না করে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তেই আসেন নি। বাস্তবের সংঘাতে তাঁর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেছেন। তাই তাঁর জীবদ্দশাতেই পাঁচ পাঁচবার অর্গানন অব মেডিসিনের সংস্কার করেছেন। মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন—আমার পূর্ব সিদ্ধান্তের এই এই ভুল ছিল। কাজেই এই এই সংশোধন হওয়া উচিত। বলেছেন—আমি বলছি বলে অন্ধভাবে আমাকে অনুসরণ কোরো না। ভুল থাকলে বাতিল করে দাও। **Publish the failures**। হ্যাকার সাহেব যখন জঘন্য ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করে লিখলেন, তিনি বললেন 'এটা গালাগালি দেবার হ্যাকারিয়ান রীতি মাত্র। যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করুন। **Truth will never be untruth**'।

৭। 'তাহলে যখন আর্সেনিক খেলে পেট ব্যথা, দাস্তবমি হয়, আর্সেনিক নিশ্চয়ই কলেরার ওষুধ'। আর্সেনিক নিশ্চয়ই কলেরার ওষুধ, অবশ্য যদি আর্সেনিকের লক্ষণসমষ্টি থাকে। আর্সেনিকের লক্ষণ যদি পেট ব্যথা ও দাস্তবমিতে সীমাবদ্ধ রেখে চিন্তাভাবনা করেন তবে সেটা

---

*শ্রীদীপাঞ্জন রায়চৌধুরী শ্রীমণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের মূল লেখাটির সংক্ষিপ্ত ভাষ্য তৈরী করেছিলেন।

সঃ মঃ, বি-ও-বি

অন্ধের হস্তী দর্শনের থেকে উচ্চ পর্যায়ের কিছু হবে না। আংশিক শর্তে বিজ্ঞান আকাঙ্খিত ফল দেয় না। পেট ব্যথা এবং দাস্তবমির লক্ষণ প্রকাশ করতে এবং আরোগ্য করতে পারে এ রকম ওষুধ ৩৫৬টার খবর যে কোন মেটেরিয়া মেডিকায় পাওয়া যাবে।

৮। 'ওষুধ নির্বাচনে এই আপ্তগ্রাহ্য পদ্ধতি,' উদ্ভট ওষুধ প্রভৃতির ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন, 'এই ঝোঁকের মধ্যে মধ্যযুগীয় ভেষজবিদ্যা ও কিমিয়ার (**alchemy**) প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না কি ?'

হ্যাঁ, যায়। যদি পূর্ব ধারণার সমর্থনে হাঁসজারু তৈরী করা হয়। বাস্তবে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত সহজবোধ্য।

৯। সদৃশ বিধানের আরেক ধরণের প্রয়োগ ব্যাপারে যা উল্লেখ করেছেন তাকে হোমিওপ্যাথি কে বললো ? এ তথ্য কোন গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে ? এটা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা দরকার। ও রকম ধরনের কোনো প্রয়োগ হোমিওপ্যাথিতে কস্মিন কালে ছিল না। বর্তমানেও নেই।

১০। 'হ্যানিম্যানের মতে ওষুধ যত কম বস্তুগত (**less material**) হবে তত বেশী হবে তার ক্ষমতা…'।

হ্যানিম্যানের বক্তব্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত। আমাদের ধারণা বক্তব্যটা বুঝতে না পারায় দরুন গোলমাল হয়ে গেছে।

১১। 'জানা কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে ডাইলিউশনের এসব গুণ ব্যাখ্যা করা যায় না।' ডাইলিউশনের গুণের কথা বলা হয়নি। তার থেকেও দরকারী ও দামী কথা বলা হয়েছে। ডাঃ হ্যানিম্যানের অর্গানন অব মেডিসিন পড়লে বুঝলে, আসল জিনিষটা বোঝাও যায়, ব্যাখ্যাও করা যায়। আধুনিক বিজ্ঞান হ্যানিম্যানের সিদ্ধান্তকে আরো জোরদার করেছে।

১২। 'রোগ ও তার নিরাময়ের বিধিতে কোনো শৃঙ্খলা আনার বিরোধী এই দৃষ্টিভঙ্গী কখনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পারে না।'

রোগ ও তার নিরাময়ের বিধিতে শৃঙ্খলা যদি কোনো প্যাথিতে থাকে তা হোল একমাত্র হোমিওপ্যাথি। (আর এ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় রোগ এবং ওষুধ প্রয়োগের মধ্যে শৃঙ্খলাহীনতাই সব চেয়ে দুর্বল দিক)।

১৩। নেট্রাম মিউর ১৩৪৯টি লক্ষণ আছে বলেই নেট্রাম মিউরের লক্ষণ যুক্ত রোগীর ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস অব মেডিসিনএ উল্লিখিত প্রায় সর্ব রোগে এই নেট্রম মিউর প্রযোজ্য হতে পারে। এবং এ প্রয়োগ আরোগ্যকারী।

১৪। হোমিওপ্যাথির ডোজ নিয়ে বিতর্ক বিষয়ে ধারণ ও ঠিক নয়।

১৫। খোস পাঁচড়া তত্ত্ব নামক উদ্ভট মনগড়া তত্ত্ব কোন উর্বর-মস্তিষ্ক প্রসূত জানলে পারলে ভাল হয়।

১৬। 'বিভ্রান্ত জার্মান সমাজ জীবনে বেশ কিছু আজগুবি তত্ত্ব গজিয়ে ওঠে। এরই একটি হোমিওপ্যাথি।'

বিজ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রদের আজগুবি চিন্তাধারা বিজ্ঞান-মনাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার দৈন্যই প্রকাশ করে। না জানা বিষয়ে মতামত যাঁরা প্রকাশ করেন—তাঁরা বিসমিল্লায় গলদ করেন। হোমিওপ্যাথির তত্ত্বটা অনুগ্রহ করে জানুন, বুঝুন, অন্তত বুঝবার চেষ্টা করুন। তারপর না হয় বিচার বিশ্লেষণ করে, অযৌক্তিক যদি কিছু থাকে, যুক্তি দিয়ে তাকে খণ্ডন করে রায় দেবেন! বিজ্ঞানীদের এত উন্নাসিক হলে চলে ?

১৭। বিশ্বাসের যেখানে শুরু বিজ্ঞানের সেখানে শেষ। হ্যাঁ ঠিক তাই। হ্যানিম্যান যুক্তিবাদী মন নিয়ে বিচার করতে বলেছেন। বিশ্বাস করতে বারণ করেছেন—**No faith, no faith at all.**

১৮। 'চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতার ফলেই মানুষের হোমিও প্রীতি ঘুচছে না।' কথাটা সত্য। হোমিওপ্যাথি আসলে এই সীমাবদ্ধতার কিছুটা উপরে অন্য প্যাথির তুলনায়। (তাই ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার বিধান সভায় দাঁড়িয়ে ডাঃ বিধান রায়কে বলেছিলেন, যে রোগীর চিকিৎসা আপনি পারবেন না—আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন- বেশীর ভাগই ভাল করে দেবো। বিজ্ঞানের উপর যথার্থ আস্থার ফলে এক চিকিৎসা বিজ্ঞানী আরেক চিকিৎসা বিজ্ঞানীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পেরেছিলেন)।

১৯। 'প্রাকৃতিক নিয়মে আপনিই সেরে যায়'। বিশ্বখ্যাত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারও এই একই কথাই একদিন বলেছিলেন। আবার তিনিই যেদিন হোমিওপ্যাথি কি বুঝতে পারলেন, সেদিন নিঃশর্তভাবে সেকথা প্রত্যাহার করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে।

আরেকটা কথা হোলো, ক্রনিক ডিজিজ বিনা চিকিৎসায় কখনো সারে না।

২০। অর্থ নৈতিক দিক ছাড়াও হোমিওপ্যাথির আরোগ্যকর দিকই ভারতে হোমিওপ্যাথির প্রসারের মূল কারণ।

২১। হোমিওপ্যাথিকে সরকারী স্বীকৃতি দান করে শাসকেরা চিকিৎসা যোগানো দায় থেকে হালকা হতে চাইছেন—এটা বোধহয় যথার্থ নয়। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যতটুকু স্বীকৃতি আদায় করা গেছে তা হোমিওপ্যাথদের সংগ্রাম এবং জনমতের চাপেই হয়েছে। সংগ্রামের ইতিহাসটা নেহাৎ ছোট নয়।

২২। একটা নির্দিষ্ট শক্তি পর্যন্ত ওষুধের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগে।

২৩। গুণমানের প্রমাণ রোগীদের নির্দোষ আরোগ্য।

২৪। আই. এম-এর মত সংস্থাগুলো কতকগুলি উন্নাসিকের আখড়া

নয় বলে হোমিওপ্যাথিকে ভূয়া চিকিৎসা বলে মনে করেন না। অনেক স্বনামধন্য এ্যালোপ্যাথ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও তাই হোমিওপ্যাথদের কাছে রুগী পাঠান। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় খ্যাতনামা এ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন। এ ভারতে বর্তমানে তার সংখ্যা দু'শয়ের উপর।

২৫। এনসাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা ও বৃহৎ সোভিয়েট এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার সংকলকরা হোমিওপ্যাথির অথরিটি বন। তাঁরা প্রচলিত ধ্যানধারণার ভিত্তিতেই মন্তব্যগুলি করেছেন বলে মনে হয়। যেমন সাধারণ অভিধানে উল্লিখিত চিকিৎসা বিষয়ক শব্দের অর্থ যথার্থ হয় না--- যা চিকিৎসা বিষয়ক অভিধানে অধিকতর অর্থবহ রূপ পায়।

হোমিওপ্যাথির বিষয়ে প্রবন্ধকারেরা চিন্তাভাবনা করেছেন, পরিশ্রম করে জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু তাঁরা ডাঃ এস. হ্যানিম্যানের অর্গানন অব মেডিসিনের ষষ্ঠ সংস্করণটা যদি অনুধাবন করতেন, যদি ক্রনিক ডিজিজ, লেসার রাইটিংস পড়তেন প্রবন্ধকারদের মত জ্ঞানী লেখককেরা, বিজ্ঞানের আরেকটা দিকের আলোয় আলোকিত হয়ে তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারতেন বলে বিশ্বাস করি।

ডাঃ বিশ্বাস নন্দী, [সম্পাদকমণ্ডলী, 'হোমিও সমীক্ষা'র পক্ষে] ১১৫/ই লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

• •

'শুধু তত্ত্ব নয়, প্রয়োগে আসুন'

হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত কিনা এ প্রশ্ন নতুন নয়, হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের সময় থেকে এ প্রশ্ন ছিল। আজকেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। এটাই স্বাভাবিক গতির লক্ষণ, প্রগতির সূচক। লেখক বন্ধুদ্বয়ও সে প্রশ্নটি তুলেছেন—সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু একটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের শাখাকে যথার্থভাবে না জেনে বা না বুঝে "মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবজ, জ্যোতিষ, হাত দেখা" প্রভৃতির মতো ভূয়া চিকিৎসা পদ্ধতি বলে উড়িয়ে দেওয়া, হেয় প্রতিপন্ন করা, সর্বোপরি জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা কি যথার্থ বিজ্ঞানকর্মীর কাজ? আমরা মনে করি এ ধরনের কাজ প্রগতির অন্তরায়, এর ফলে প্রতিক্রিয়ার হাতকেই শক্তি যোগায়।

মাননীয় লেখক বন্ধুরা যে সব সূত্র ধরে হোমিওপ্যাথিকে নস্যাৎ করেছেন হোমিওপ্যাথির ব্যাপারে সে সব সূত্রই কি কেবলমাত্র অথরিটি? আমরা তা মনে করি না।

বিগত প্রায় দুশ বছর ধরে হাজার হাজার খ্যাত অখ্যাত হোমিও চিকিৎসকের হাতে (তন্মধ্যে আমাদের নামজাদা চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মতো বহু খ্যাতনামা এ্যালোপ্যাথ কনভার্টেড হয়ে হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করেছেন। এমন ডাক্তারের সংখ্যাও সারা বিশ্বে সম্ভবত হাজারের বেশী হবে) লক্ষ লক্ষ চির-অচির রুগ্ন মানুষ নিরাময় লাভ করেছেন (যাদের মধ্যে এ্যালোপ্যাথি বা অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিফলমনোরথ রোগীর সংখ্যাও যথেষ্ট আছেন)। এই বাস্তব সত্যটি ঐ ঐ সূত্রগুলোর চেয়ে কি বড় অথরিটি নয়? বিজ্ঞানকর্মীরা জানেন, "প্রয়োগ ছাড়া তত্ত্ব বন্ধ্যা," সুতরাং আমাদের আবেদন শুধু তত্ত্ব (theory) নিয়ে ব্যস্ত না থেকে প্রয়োগ (practice)-এ আসুন।

"রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুসমূহ অনুরূপ রোগ নিরাময় করে (similia similibus curentur) হ্যানিম্যান ও হোমিওপ্যাথির বহু আগে প্রাচ্যে-প্রতীচ্যের বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও তারপরে মহান হিপোক্রেটিসের এই অন্যতম তত্ত্বে কি ভাববাদ বা ভাগ্যবাদ আছে তা আমরা বুঝিনি। হ্যানিম্যানের অপরাধ হচ্ছে যে হিপোক্রেটিসের পরবর্তী (বা পূর্ববর্তী) মনীষী বিজ্ঞানীরা তাঁর এই তত্ত্বটিকে পাশ কেটে গেছেন। হ্যানিম্যান গবেষণা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ তত্ত্বটিকে তথা চিকিৎসা পদ্ধতিকে একটি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি দিয়েছেন। কাজেই হোমিওপ্যাথি বা সদৃশ-বিধানের তত্ত্ব হ্যানিম্যানের উদ্ভাবন নয়, তাঁর আবিষ্কার মাত্র।

মহান বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচিত ডাঃ মহেন্দ্রলালের জীবনী থেকে সামান্য প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি: "মহেন্দ্রলাল যা সত্য বলে উপলব্ধি করতেন তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন না কখনও। প্রকৃত বিজ্ঞানীর এ মনোভাব তাঁর চরিত্রে ফুটে উঠেছে। তিনি এ্যালোপ্যাথ নীতিতে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। যখন হোমিওপ্যাথিতে সত্যবস্তুর সন্ধান মিলেছে বুঝলেন তখন তাকে বরণ করে নিলেন। তাঁর বিশ্বাস হল, রোগ শান্তির যে ব্রত গ্রহণ করেছেন তা হয়ত এইভাবে আরো ভালো করে করা সম্ভব হবে। কাজেই অনায়াসে বরণ করলেন হোমিওপ্যাথির পদ্ধতিকে।"

(রচনা সংকলন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পৃঃ ১৫৪)

মাননীয় লেখক বন্ধুদের মতো একই ধরনের প্রশ্নের সমাধানের জন্য "বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ" গত ১৩ ও ১৪ই নভেম্বর, ১৯৮০, একটি হোমিওপ্যাথিক বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। লেখক বন্ধুরাও অনুরূপ একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করতে পারেন। এগিয়ে যাবার, এগিয়ে নেবার অন্যতম পথ হিসেবে "সমালোচনা, আত্ম-সমালোচন"কে আমরা সব সময় অভিনন্দিত করি।

হরিমোহন চৌধুরী, হোমিওপ্যাথি ইন্টারন্যাশনাল, ১১৫ই লেনিন সরণী, কলিকাতা-১৩।

প্রতিবাদের উত্তর ও হোমিও প্রসঙ্গে আরো কিছু

এক। বিতর্কিত হোমিও চিকিৎসার উপর আমার পূর্বেকার লেখার সমালোচনা করার জন্য পত্রলেখকদের ধন্যবাদ। বিজ্ঞানে সত্যানুসন্ধানে আলোচনা ও সমালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরের সাথে না-বলা আরো কিছু কথা এবারে জানিয়ে যেতে চাই যাতে জনসাধারণ—বিশেষ করে বিজ্ঞানকর্মীরা—হোমিওপ্যাথি কতটা বিজ্ঞানসম্মত তা নিজেরাই বিচার করতে পারেন। চিরাচরিতভাবে পত্রলেখকেরা সজোরে দাবী করেছেন হোমিওতে প্রচুর অসুখ সারে। যা তাঁরা বিশ্বজনীন সত্য বলে ধরে নিয়েছেন তাতে আমি ছাড়াও বহু সৎ ও প্রবীণ চিকিৎসকদের সন্দেহ আছে। 'এ্যালোপ্যাথি' হাসপাতালের জনপ্রিয়তা, উক্ত চিকিৎসায় ভালো ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ ও লোকের 'দায়ে পড়ে অবশেষে এ্যালোপ্যাথের শরণাপন্ন হওয়া' তার প্রমাণ বলে মনে হয়। নানারকম 'ম্যাজিকিওরের' গল্প ছাড়া এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত সুসম্বদ্ধ তথ্য কোথায়? অপরপক্ষে, বহুক্ষেত্রে হোমিও চিকিৎসার নামে রোগী বিনা চিকিৎসায় থাকে এবং বহু অসুস্থ শিশু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যথাযথ চিকিৎসা সময়মত পায় না। ফলে বহু শিশু মারাত্মকভাবে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে, অনেকে মারাও যায়। হোমিও চিকিৎসায় কত লোকের কত ক্ষতি হয়েছে তার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পারলেও তা কম ভয়াবহ হবে না। (এ থেকে যেন এ ধারণা কারো না হয় যে তথাকথিত এ্যালোপ্যাথি বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নামে যা এদেশে চলছে তাতে কোন ক্ষতি হয় না, তার সবই ভালো)।

দুই। সাধারণভাবে হোমিওপ্যাথদের কাছ থেকে যা শুনি সেই পুরাতন অসার কথা পত্রলেখকেরা আবার বলেছেন। সবিনয়ে জানিয়ে রাখি মহেন্দ্রলাল সরকার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার সহ দেশী বিদেশী আধুনিক বিজ্ঞান পড়া (FRCS, MRCP, MD, Ph. D, D. Sc. প্রভৃতি ডিগ্রীধারী) তথাকথিত এ্যালোপাথরা হোমিওপ্যাথি করলেই হোমিওপ্যাথি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায় না। এমন কি শ্রদ্ধেয় সত্যেন বসুর মহেন্দ্রলাল সরকার সম্বন্ধে মন্তব্য থাকলেও না। বিস্তর নামী দামী বিজ্ঞানীরা (!) সাঁইবাবার অলৌকিক মাহাত্ম্য প্রচার, প্রেতচর্চা, হাত দেখা, কোষ্ঠী বিচার করলেও বিষয়গুলি বিজ্ঞানসম্মত হয়ে যায় না। জীবাণুর আক্রমণে অসুখ হয় না, অসুখ হলেই জীবাণু জন্মায়; টীকা দেওয়ার সুফল নাই, ওটা কুসংস্কার, ইত্যাদিধারণা পোষণ ও প্রচার করলেও জর্জ বার্ণার্ড শ'র এইসব কথা সত্য হয়ে যায় না। স্যার উইলিয়াম ক্রুকস্, স্যার অলিভার লজ, রাসেল আলফ্রেড ওয়ালেস থেকে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, অভেদানন্দ প্রমুখরা পরলোক-সংযোগ করলেও, প্রেততত্ত্ব সত্য হয়ে যায় না। নোবেলবিজয়ী শারীর-বিদ চার্লস রিকেট আত্মার সূক্ষ্মশরীরে নানাস্থানে যাতায়াতের জন্যে এক্টোপ্লাজমের উদ্ভট ধারণার উদ্ভাবন ও প্রচার করেন। সুতরাং কোন বিশেষ বিষয়ে কৃতী পণ্ডিত বা অথরিটির অন্য বিষয়ে মতামত ব্যবহার করে সত্যানুসন্ধানের চেষ্টা ঠিক কি?

তিন। বিচারের মানদণ্ড।

পত্রলেখক শ্রীনন্দী লঘুকরণ (ডাইলিউশন) তত্ত্বকে বিজ্ঞানসম্মত দাবী করেছেন। 'সদৃশবিধানের আর এক ধরনের প্রয়োগ' হোমিও নয়, আমাদের সোরার (psora) ধারণা ঠিক নয়, বলেছেন। প্রয়োজনীয় vital force vital energy, vital principle ইত্যাদির ধারণা করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাহলে আর একটু বিস্তারিত আলোচনায় যেতে হবে। তাহলে শ্রীনন্দীর কথার উত্তরও হবে, জনসাধারণের বোঝার সুবিধেও হবে। এর জন্যে হোমিওপ্যাথি সহ আরো কিছু তথ্য, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। আলোচনার শুরুতেই ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন হোমিওপ্যাথিকে কিভাবে বিচার করা হবে: (ক) যেভাবে এর ব্যবহার ও প্রয়োগ হচ্ছে সেইভাবে, না (খ) এর তাত্ত্বিক ভিত্তি ও দর্শন দিয়ে? মূল প্রশ্ন হল কোন চিকিৎসা পদ্ধতিকে হোমিও বলে চেনা যাবে এবং কি দিয়ে? যে ভাবে এর প্রয়োগ হচ্ছে তা দেখলে কোন কূল-কিনারা পাওয়া যাবে না। কেউ গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে রোগী আকৃষ্ট করেন, কেউ আবার নানা উপসর্গে হোমিও ওষুধের নামে এ্যাসপিরিন, এন্টেরোকুইনল, এ্যান্টিবায়োটিক, স্টেরয়েডও দেন। হোমিও ওষুধে কি আছে যাচাই করা দুষ্কর, কারণ হ্যানিম্যানের উপদেশমত বেশীর ভাগ হোমিও চিকিৎসক নিজেদের ওষুধ উৎস (source) থেকে নিজেরা তৈরী করেন না, এমন কি কোন উদ্ভিদ, কোন প্রাণী, কোন ধাতব যৌগ ওষুধের উৎস, তাদের এক খটমট ল্যাটিন নাম ছাড়া বস্তুর সাথে পরিচিতই নন। হোমিও ওষুধে রোগীরা কেমন ভালো হয় তার কোন বিজ্ঞানসম্মত পরিসংখ্যানও পাওয়া যায় না। তাই হোমিওপ্যাথির অনুজ্ঞাসূচক সদৃশবিধান যেখানে প্রযুক্ত হচ্ছে তাকেই হোমিওপ্যাথি বলতে হবে। সুতরাং হোমিওপ্যাথির মূল্যায়নে শাস্ত্র ধরে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন।

হোমিওপ্যাথদের বাইবেল 'অর্গানন অব মেডিসিন' এর ভিত্তিতেই আলোচনা করতে হবে (শ্রীনন্দীর উপদেশ অনুসারেও বটে)। আশা করি মার্জনা পাব কারণ—হ্যানিম্যানের ভাষায়—"মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার স্বাস্থ্য ও জীবন, যার উপর নির্ভর করে সেই চিকিৎসাপদ্ধতির ভিত্তি কতটা ঠিক তার একটি গভীর অনুসন্ধানে কেউ কাউকে নিষেধ করতে পারে না।"

চার। অসুখ হওয়া ও সারা সম্বন্ধে হোমিও মত।

অসুখ কেন হয়, কি করে রোগীকে অসুস্থতা থেকে সুস্থতায় নিয়ে যাওয়া যায়, হোমিও ওষুধ কি করে কাজ করে, হোমিও ওষুধ কি করে বানানো যায়, ইত্যাদি বিষয়ে হ্যানিম্যানের বক্তব্য সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক। হ্যানিম্যান লিখেছেন[1]:

"কোন বস্তু, কোন কটুতা (acridity), অসুখ ঘটানোর কোন জিনিষে যে মানুষের অসুখ হয় না তা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির কাছেই পরিষ্কার। অসুখ হবার কারণ হল আত্মার মত যে জীবনীশক্তি মানুষকে (সুস্থতা-অসুস্থতায়) সঞ্জীবিত রাখে সেই ভাইটাল ফোর্সের গতিময় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে" (78-79 পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য)।

অসুখ হবার কারণ অর্গাননের ভাষাতেই আর একটু শোনা যাক।

"When a person falls ill, it is only this spiritual self-acting automatic vital force, everywhere present in his organism, that is primarily deranged by the dynamic influence upon it by a morbific agent inimical to life; it is only the vital force, deranged to such an abnormal state, that can furnish the organism with its disagreeable sensation, and incline it to the irregular process which we call discase...It is only the morbidly affected vital force, (6 Ed., energy) alone that produces disease" (পৃ78-79)।

অসুখ তাহলে সারানো যাবে কেমন করে? হ্যানিম্যানের তত্ত্ব, তাঁর বিধান: এক রোগ দিয়ে অনুরূপ আর এক রোগ সারাতে হবে। হ্যানিম্যান বলছেন (পৃ: 84):

"A weaker dynamic affection is permanently extinguished in a living organism by a stronger one, if the latter, whilst differing in kind, is very similar to the former in its manifestations."

হ্যানিম্যানের ধারণা ছিল (পৃ: 85-89): শরীরে অবস্থিত অধিক শক্তিশালী পুরাতন রোগ কম শক্তিশালী আক্রমণকারী নূতন রোগ ঢুকতে দেয় না (রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে পুরাতন দেবরোষ, ভূত প্রভৃতির ধারণা স্মরণীয়—লেখক)। সমশক্তির হলে পুরাতন রোগের জোর বেশী। কঠিন ক্রনিক' রোগে যে ভুগছে, চট করে তাকে 'শরৎকালের ডিসেন্ট্রি'তে বা অন্য কোন সংক্রামক রোগে ধরতে পারে না। যেখানে স্কার্ভি আছে সেখানে প্লেগ ঢুকবে না, যেখানে কেউ একজিমায় ভুগছে সেখানেও না। ফুসফুসের ক্ষয়রোগ থাকলে মৃদু সংক্রামক জ্বর হয় না। গোলকৃমি (টিনিয়া) থাকলে মৃগীর ফিট হয় না। স্কার্ভি হলে চুলকানি যায়, টাইফাস হলে ফুসফুসের ক্ষয়রোগ বন্ধ থাকে, ইত্যাদি। এখন, আজকের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের থেকে আমরা জানি এসব ধারণাবলীর সবটা ঠিক নয়। এসবে (প্রধানত ভাইরাস ঘটিত অসুখে) সত্যের সামান্য কিছু হয়তো আছে, কিন্তু **হ্যানিম্যান তাকে সর্বজনীন রূপ দিয়ে অপজ্ঞানের রাজ্যে চলে গেছেন।**

হ্যানিম্যান বলেছেন (পৃ: 39): হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে রোগ দূর করতে প্রকৃতির ভাণ্ডারে অসুখের সংখ্যা খুব কম; যেগুলোও আছে সেগুলোরও আবার নানা ঝামেলা। অথচ চিকিৎসকের হাতে বিস্তর সুবিধাজনক রোগনিরাময়ী অস্ত্র আছে। মনুষ্যদেহ প্রাকৃতিক অসুখে যতটা প্রভাবিত হয় তার চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবিত হয় ঔষধ (বা বিষ) ক্রিয়ায়। প্রাকৃতিক অসুখের চেয়ে ভেষজসৃষ্ট অসুখগুলি একই রকম হওয়া সত্ত্বেও শক্তিতে ও গুণে উন্নততর।

এইসব উপলব্ধিতে বলীয়ান হয়ে হ্যানিম্যান নানান বিষ, উদ্ভিজ্জ, জান্তব, ধাতব দ্রব্যাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিকিৎসায় প্রয়োগ শুরু করলেন। সিঙ্কোনা কম্পজ্বর বা ম্যালেরিয়া সারায় আবার কম্প-জ্বর আনে—এই সংবাদ হ্যানিম্যানকে চঞ্চল করে তুলেছিল (1790 খৃ:)। সদৃশ বিধান এল 1796 সালে। সেই সময়েই এডওয়ার্ড জেনার বসন্তের টীকা দান শুরু করলেন। আদিম জাদু ধারণায় বিশ্বাসও হ্যানিম্যানকে চট করে এই হটকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করল। হোমিও-প্যাথিতে জাদুবিশ্বাসের দুই মূল নীতি[2]—হোমিওপ্যাথিক বা সদৃশ জাদু ও কন্টাজিয়াস বা সংস্পর্শ জাদু—সক্রিয় দেখা যায় (এককালে ন্যাবারোগ সারানোর জন্য জাদুবিশ্বাস অনুসারে সোনা খাওয়ানো হত, হলদে পাখী কিনে ন্যাবারোগীকে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে হত। জাদুকে বিশিষ্ট পণ্ডিত ফ্রেজার Barren Art, Spurious System of Natural Law ইত্যাদি বলেছেন ও বিশদভাবে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন)। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে ইমিউনোলজি থেকে জানা যায়[3] যে রোগসৃষ্টিকারী কোন 'প্যাথোজেন' (জীবাণু, ভাইরাস, বিষ ইত্যাদি) শরীরে ঢুকলে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে শরীর কখনো কখনো 'এ্যান্টিবডি' তৈরী করে নেয় বা তৈরীর কৌশল আয়ত্ব করে নেয়। যার জন্য অ্যান্টিবেডি তৈরী হয়, বিশেষ সেই

এ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধেই শরীরের প্রতিরক্ষা হয়, অন্যের জন্যে নয়। এক জাতের ভাইরাসের বিরুদ্ধে শরীরে এ্যান্টিবডি থাকলেও প্রায়ই কাছাকাছি জাতের ভাইরাসের বিরুদ্ধে তা কাজে দেয় না। তাই সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, এন্‌কেফেলাইটিস ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া আজও অসুবিধের। তাই উদ্ভিদের কোন এ্যালকালয়েড গ্লাইকোসাইড অল্প ডোজে দিয়ে জীবাণু, ভাইরাস বা অন্য জাতের 'টক্সিন' ঘটিত অসুস্থতার প্রতিবিধান সদৃশবিধান অনুযায়ী সম্ভব না। সুতরাং হ্যানিম্যানিয় হোমিওপ্যাথির মূলনীতি—সদৃশবিধানের ভিত্তিই ভ্রান্ত।

পাঁচ। অচল তত্ত্বাবলী।

(ক) এইবার আসা যাক মিয়াজম, ভাইটাল ফোর্সের তত্ত্বে, এ্যালোপ্যাথি ওষুধের হ্যানিম্যান-কথিত মারাত্মক কুফলে এবং রোগ নয়, সমগ্র রোগীর চিকিৎসার হ্যানিম্যানিয় ধারনায়। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে বিশ্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যত বেড়েছে, সেগুলি চিকিৎসাচিন্তা ও চিকিৎসাপদ্ধতিকেও প্রভাবিত তত করেছে। ভূ-কেন্দ্রিক প্রাচীন ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বে বিশ্ব ছিল macro-cosmos এবং ধারণা ছিল ঈশ্বর সেই ধাঁচে মানুষ তৈরী করেছেন[4,5]। মনুষ্যদেহ হল micro-cosmos। প্রাচীন গ্রীকদের (হিন্দুদেরও) ধারণা ছিল চারটি মূলধাতু (elcment) —আগুন, বাতাস, জল ও মাটি—যেমন বিশ্বের সবকিছুর মূলে আছে, তেমনি মনুষ্যদেহের ক্ষুদ্রবিশ্বে আছে রক্ত, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও কালোপিত্ত। চিকিৎসাচিন্তায় এইসব হিউমারের (humour) ভিত্তিতে অনুপাত অনুসারে মানুষ সজীব, খিটখিটে নিষ্প্রভ এবং বিষাদগ্রস্ত (sanguine, choleric, phlegmatic, melancholic) হয়। বায়ু, পিত্ত ও কফের ত্রিধাতুর সাথে গ্রীকদের হিউমার তত্ত্বের মিল দেখা যায়—যা হিপোক্রেটিস গ্যালেন প্রমুখ পুরাতন প্রায় সবাই বিশ্বাস করতেন। হ্যানিম্যান এর বদলে করলেন মিয়াজম তত্ত্বের আমদানী। 'miasmata' শব্দ থেকে সম্ভবত হ্যানিম্যান miasm বানিয়েছেন এবং সোরা, সাইকোসিস, সিফিলিস (psora, sycosis, siphillis) এই তিন মিয়াজম হোমিও-প্যাথির গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। হিপোক্রেটিসের মিয়াজমাটা ছিল ঠাণ্ডা, গরম, বাতাস (cold, sun, winds)। এগুলি ছিল রোগসৃষ্টিকারী দেবরোষ-জাত কুবাতাস। স্বপ্ন ও স্মৃতির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে পুরাতন প্রস্তর যুগে আদিম মানুষ আত্মার অলীক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিল[4]। কালক্রমে আত্মার দৈহিক ও মানসিক দুরকম কাজ মানুষ ভাবল। দৈহিক গঠন[6] কিছু জানার পর আত্মা তিন রকম হ'য়ে গেল : লিভারে থাকে স্বাভাবিক আত্মা (natural soul) হৃৎপিণ্ডে থাকে জীবাত্মা (animal soul) আর মস্তিষ্কে থাকে বুদ্ধির আত্মা (rational soul)। এরা ঠিক মেজাজে থাকলে লোক ভালো থাকে।

সোরার অর্থ খোস-পাঁচড়া করায় পত্রলেখক শ্রী নন্দী যথার্থভাবেই আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু সোরার (psora) অর্থ[9] খোস পাঁচরাও হয় এবং সোরিনাম এই হোমিও ওষুধ খোস-পাঁচরার রস থেকেই হয়[7]। তবে সঠিক হ্যানিম্যানিয় অর্থে সোরা একটি মিয়াজম যাকে ঘাঁটালে খোস-পাঁচড়া প্রভৃতি বাড়তে পারে। হ্যানিম্যান বলেছেন (পৃ : 115) "সিফি-লিটিক ও সাইকোটিক বাদ দিলে সত্যকার অন্যসব পুরাতন রোগের মাতা হল সোরা।" হিউমার বা আয়ুর্বেদীয় ত্রিদোষের মত হ্যানিম্যানের মিয়াজম তত্ত্বও পরিত্যজ্য।

(খ) রোগ নয়, সমগ্র রোগীর চিকিৎসা করতে হবে—এর মধ্যে "দেহ ও আত্মা" এই সমগ্রকেই হ্যানিম্যান বোঝাতে চেয়েছেন। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের দেহ ও মন বা 'সাইকোসোমাটিক' ধারণা এটি নয়। অনিষ্টকারক মিথ্যা এ্যালোপ্যাথি ওষুধের ভেতর দিয়ে এক 'irrational vital force' শরীরে ঢুকে অসংখ্য অসুখ জাগিয়ে তোলে ('kindles the countless diseases')। জীবকে যন্ত্র হিসাবে বোঝা সম্ভব বলে ডেকার্টে বোরেলি, গ্যালভ্যানি, হেলমহোলজ, ক্লড বার্নার্ড, চার্লস ডারউইন প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মনে করতেন[4, 5, 6]। এঁরা যন্ত্রবাদী (mechanists)। এর বিপরীতে সুপ্রাচীন কাল থেকে বেশীর ভাগ লোক (আজও অনেকে), উল্টো বিশ্বাস করতেন[4,5]। জে, ডি, বার্ণাল (পৃ: 937) লিখেছেন : "দেহকে অর্কৃত, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দেয় যে ভাইটাল ফোর্স সেই আত্মা মন, বা ভাইটাল ফোর্সের তত্ত্ব হল একটি অতি পুরাতন জাদু ধারণা যাকে গ্রীকরা যুক্তি দিয়ে দাঁড় করিয়েছিল এবং আরবদের মাধ্যমে যা আধুনিক বিজ্ঞানে ঢুকে পড়েছিল।" লোকে ভাবত আত্মা, মন বা প্রাণশক্তির (soul, psyche or breath of life) মত দেহাতিরিক্ত একটা কিছু আছে যা জীবকে বিশেষত্ব দেয়। কিন্তু কোপার্নিকাস থেকে নিউটন পর্যন্ত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে নানা বৈপ্লবিক আবিষ্কারের ফলশ্রুতিতে পুরাতন বহু ধারণার ভিত্তিই ধ্বসে পড়ে। তার প্রতিক্রিয়ায় আত্মার ফ্লোজিস্টন-তত্ত্ব খ্যাত স্টাল (1660-1734) এ্যানিমা (anima) কথার প্রচলন করলেন। এটিই পরে ভাইটাল ফোর্স রূপে হ্যানিম্যানের চিন্তায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করল। হ্যানিম্যান বিশ্বাস করতেন মানুষকে জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা দিয়ে বোঝা যায় না, কখনো বোঝা সম্ভবও না।

যন্ত্রবাদী ও প্রাণবাদীদের বিরোধে এক বিজয় হয় 1828 সালে ভোল্‌হারের আবিষ্কারের ফলে। চরম বিজয় অবশ্য বিংশ শতকের আগে হয়নি। জীবনীশক্তিরহিত অজৈব জড় জগৎ থেকে জৈব পদার্থ আসতেই পারে না—এই ধারণার মূলে ঘা পড়ল অজৈব পদার্থ থেকে ভোল্‌হারের ইউরিয়া সংশ্লেষণের মাধ্যমে। শতসহস্র বিজ্ঞানী ও সাধকের পরিশ্রমের ফলে জীবের পুষ্টি, শ্বাস-প্রশ্বাস, বংশবৃদ্ধি, রোগব্যাধি, মস্তিষ্ক, মনস্তত্ত্ব স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সমূহের কার্যাবলী সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বেড়েছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভিত্তি রচিত হয়েছে। হোমিওপ্যাথি তার ভ্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে তাই এগুতে পারল না।

(গ) হ্যানিম্যান বলতেন এ্যালাপ্যাথদের রোগের লক্ষণ উপশম করবার জন্য চিকিৎসা পদ্ধতি (antipathic, enantiopathic or palliative method) একেবারেই ভুল ও ক্ষতিকর। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী জর, খোস, দাস্ত, ব্যাথা, বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ ফুটিয়ে শরীর নিজেকে ভালো করতে চায়। চিকিৎসকের—হোমিওচিকিৎসকের - কাজ হল ওষুধ দিয়ে অনুরূপ রোগ লক্ষণ আরো ফুটিয়ে প্রকৃতিকে সাহায্য করা যাতে শরীর সুস্থ হয়। রোগীকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে রোগের ভাষা বুঝতে হবে এবং সুস্থ লোকের শরীরে ওষুধ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা দেখে ওষুধের ভাষা বুঝতে হবে। এই পদ্ধতিতেই similia similibus curentu করে রোগীকে সাহায্য করা যাবে। সর্বত্র এই ধারণার প্রয়োগ যে ক্ষতিকারক তা সহজেই অনুমান করা যায় সোনামুখি, রেউচিনি, (Senna, Rhuburb) প্রভৃতির পেটব্যথা দাস্ত করাবার ক্ষমতা আছে অতএব হোমিওমতে ডিসেন্ট্রিতে এগুলো ওষুধ। পুড়ে গেলে গরম লাগাতে হবে 'ফ্রস্টবাইট'এ বরফ লাগাতে হবে ধুতুরায় মানসিক বিকার আনে, অতএব উন্মাদ রোগীকে ধুতরো খাওয়াতে হবে, ইত্যাদি ছিল হ্যানিম্যানের বিধান[8]।

ঘ। ... যেদে বিপরীত বিধানে (Contraria Contralis Curentur) যুদ্ধ নূতনতর রোগসৃষ্টি হবেই এবং যেহেতু দুইটি রোগ বিসদৃশ অতএব হ্যানিম্যানের বক্তব্য আগের রোগ তো সারবেই না।—হয়তো সাময়িক চাপা পড়ে থাকবে পরে অধিকতর ভয়াবহতা নিয়ে আবার রোগ্য হয়ে ফুটে উঠবে এবং নতুন ও পুরানো রোগ মিলে ভীষণ জটিলতা সৃষ্টি করবে। হ্যানিম্যানের ওষুধের এই প্রাথমিক ও পরবর্তী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার (primary and secondary reaction) ধারণা আর আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঔষধজাত অসুস্থতার (iatrogenic disease) ধারণা এক নয়।

ছয়। ঔষধ তত্ব।

এবারে হোমিও ওষুধ এবং তার লঘু ও তেজীকরণের প্রসঙ্গে আসা যাক[1,78]। পাশ্চাত্যদেশে এখনো যে সামান্য কিছু লোক (এবং যারা সকলেই প্রথাগত (orthodox) চিকিৎসাবিজ্ঞানে এম. ডি) কিছু হোমিও ওষুধ ব্যবহার করেন তাঁরা মূল আরক (মাদার টিংচার) বা চার-ছয় ডাইলিউশনের নিচে যানই না। অথচ **হ্যানিম্যানের মতে ঐ মাত্রার ওষুধ হোমিওই নয়।** তিনি তিরিশ ডাইলিউশনকেই সাধারণ ব্যবহার্য বলেছেন। হ্যানিম্যানের মতে অতি সামান্য মাত্রায় ওষুধ খাইয়ে খাইয়ে রোগীর শরীরে উপস্থিত রোগশক্তির বিপরীত এক শক্তি ভাইটাল ফোর্স সৃষ্টি করে রোগের স্থায়ী উপশম করতে হবে। তাঁর ধারণায় অল্প ডোজের হোমিও ওষুধেও পদার্থ থাকে (পৃঃ 106)। তৎকালীন রসায়নের উন্নতির স্তরে হ্যানিম্যানের মত লোকের পক্ষে এটা ভাবা খুব অস্বাভাবিক ছিলো না, কারণ এ্যাভোগাড্রো প্রকল্প (1811) ক্যানিজারোর (1858) আগে চালুই হয়নি। **হ্যানিম্যান আর একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগত ভুলের শিকার হয়েছিলেন।** প্যারাসেলসাস, সিডেনহাম (1624-89) প্রভৃতির ধারণা ছিল (যা বহুলাংশে সত্য) যে সব জিনিষই বেশীমাত্রায় বিষ, অল্পমাত্রায় হিতকারী ওষুধ। লবণ, এ্যালকোহল, আর্সেনিক, স্ট্রিকনিন প্রভৃতির উদাহরণ তো সাধারণ। এই সীমাবদ্ধ সত্যের সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে হ্যানিম্যান একেবারে অপজ্ঞানের রাজ্যে চলে গিয়েছিলেন। হ্যানিম্যান বলতেন "এইভাবে যে সব রাসায়নিক তৈরী হবে, সেগুলি রসায়নের নিয়মের আওতার বাইরে থাকে।" বিজ্ঞান দিয়ে আজো এই উদ্ভট তত্বের পরিবেশন করার প্রয়াস[10] দেখা যায়।

সাত। হোমিও ফার্মাকোপিয়া।

হাজার দুই-তিন হোমিও ওষুধ আছে যার মধ্যে মাত্র ডজন খানেক সমধিক বেশী ব্যবহার হয়। হোমিও ওষুধের সামান্য পরিচয় [1, 7, 8] প্রাসঙ্গিক। যা দেখেছি তাতে হোমিও ওষুধগুলিকে নিম্নোক্ত কটি ভাগ করা যায়।(ক) উদ্ভিজ্জ, (খ) ধাতব ও লবণ জাতীয়, (গ) জীবজন্তুর বিষ, (ঘ) নসোড (Nosode)—সংক্রামক রোগ, ঘা প্রভৃতির রস থেকে তৈরী হয়, (ঙ) সারকোড (Sarcode) জীবজন্তুর লালা বা নিঃসরণ থেকে তৈরী হয়, (চ) বিবিধ। জৈব অজৈব যে কোন বস্তু থেকেই হোমিও ওষুধ তৈরী হতে পারে। হ্যানিম্যান 1796-1839 সাল পর্যন্ত 99টি ওষুধ 'প্রতিষ্ঠা' (proving) করেছিলেন। এখনো নতুন নতুন হোমিও ওষুধ প্রতিষ্ঠা হচ্ছেই। কোন একজন চিকিৎসক ওষুধ বার করেন, অন্যেরা তা প্রয়োগ করেন, রোগীরা 'ভালো হয়'। মেদিনীপুরের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ক্লোরামফেনিকল (1959-60), কর্টিজন (1961-62) হোমিও ওষুধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিখ্যাত কিছু হোমিও ওষুধের উৎস পরিচিতি পাঠকের পক্ষে সহায়ক হবে। (ক) জাতের ভেতর পেয়াজ, পাহাড়ী গুল্ম (Arnica montana), হিঙ, বিছুটি, বিষকাঁঠালি (Belladona), লতান এক ফলের গাছ (Bryonia) কর্পূর, গাঁজা, মরিচ, কাঠকয়লা Carbo vegetabilis) সিঙ্কোনা (china, হেমলক লতা, ইপিকাক (Ipicacuanha), হাতিশুঁড় লতা (Lycopodium), জায়ফল (Nux Moschata), কুচিলা (Nux Vomica), আফিম, বিষাক্ত ওক (Rhus Tox), গাঁদা, সেডার গাছ (Thuja Occidentalis), যুঁই, ধুতরা (Strammonium), তামাক ইত্যাদি দেশ-বিদেশের লোকচিকিৎসায় ব্যবহৃত অসংখ্য গাছপালার ফুল, লতাপাতা, শেকড়বাকড়ের রস বা গুঁড়ো জল বা অ্যালকোহল দিয়ে মাদার টিংচার বানানো হয়। তারপর তার দু-ফোঁটা নিয়ে 98 ফোঁটা দিয়ে এক ডাইলিউশনের ওষুধ হয়। একই পদ্ধতিতে দুই, তিন ইত্যাদি মাত্রার ওষুধ তৈরী হয়। প্রতিবারই ভালো করে ঝাঁকিয়ে ঔষধের শক্তিবৃদ্ধি করা হয় (potentization)।

বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ ছাড়াও acetic acid, pi_ric acid, nitroglycerine, salicylic acid, petroleum প্রভৃতিও ঔষধের উৎস। হ্যানিম্যান বলতেন ঔষধ বিশুদ্ধ সহজ সরল হবে। এ্যালোপাথদের মত মিশ্র ওষুধ ব্যবহার করা ক্ষতিকারক। অদ্রাব্য বা কঠিন পদার্থের জন্যে স্থগার অব মিলক বা ল্যাকটোজ দিয়ে ঘষে (trituration) অনুরূপভাবে ওষুধ বানাতে হবে।

(খ) জাতের ঔষধের উৎসে যে সব নাম আছে ইন্‌অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারিতে তাদের প্রায় সবকটিকেই পাওয়া যায়। স্থানাভাবে ফর্মূলা দিচ্ছি, কোথাও বা সাধারণ নাম উদাহরণ: Al_2O_3, $(NH4)_2 CO_3$, Sb_2S_3, সোহাগা, I_2, Br_2, Ca-sulphate, -phosphate,-carbonate, KOH, $HgCl_2$, Hg_2Cl_2, পারদ, সোনা, তামা, টীন, লোহা, সীসা, গন্ধক, ফসফরাস, Fe-acetate,-phopsphate, sulphate, Mg-chloride,-phosphate, Na-chloride, -sulphate, HCL, $H_2 SO_4$, HNO_3. বালি, ইত্যাদি।

(গ) জীবজন্তুর বিষ—হ্যানিম্যানের ধারণা ছিল যে দ্রব্য যত বেশী বিষ, সুস্থ লোককে যা যত বেশী অসুস্থ করতে পারে, সেটা তত কার্যকর ঔষধ। এই ধরণের ঔষধের কিছু নমুনা : Crotalus Horridus (র‍্যাটল সাপের বিষ), Lachesis (সুরুকিয়া সাপের বিষ), Naja Tripudians (গোখরো সাপের বিষ), নানা জাতের মাকড়সার বিষ দিয়ে Tarantula Hispania and Cubens, Theridian, Cantharides, Apis Mellifica (মৌমাছির বিষ), Sepia (সামুদ্রিক কাট্‌ল মাছের কালি), Lac Caninum (কুকরের দুধ) Lac Felinum (বেড়ালের দুধ) Lac Vaccinum (গরুর দুধ) ইত্যাদি।

(ঘ) নসোডগুলির মধ্যে morbillinum (হামের রস), medorrhinium (প্রমেহ বা গনোরিয়ার রস), psorinum (খোস পাচরার রস), pyrogen (পচা ঘায়ের রস), syphilinum (সিফিলিসের রস), Variolinum (বসন্তের গুটির রস)। এইরকম Diptherinum, Tuberculinum, Hydrophobinum, Anthracinum, Carcinosin প্রভৃতি ছাড়াও প্রচুর আন্ত্রিক নসোড (Bowel Nosodes) আছে।

পত্রলেখক শ্রী নন্দী বলেছেন সদৃশবিধানের আর এক ধরনের প্রয়োগ সম্বন্ধে আগে আমরা যা বলেছি তা হোমিওপ্যাথি নয়। নসোডগুলো তাহলে কি?

(ঙ) সারকোড—Adrenal Cortex, Thyroidine গ্রন্থি থেকে সারকোড তৈরী হয়।

(চ) বিবিধ: এইসবের ভেতর প্রচুর মজাদার আইডিয়া প্রত্যক্ষ্য করা যায়। এগুলোও কি বিজ্ঞানসম্মত? নমুনা : Magnetis polus Arcticus (চুম্বকের উত্তরমেরুজাত), Magnetis polus Australis (দক্ষিণমেরুজাত), Electricitus বাতাস ও স্থিরবিদ্যুৎজাত), Sanicula (প্রস্রবনের জলজাত); আর Sol হল কড়া রৌদ্রের এ্যলকোহলীয় দ্রবণ!

বিষের ভেষজগুণ, মেসমারের অলৌকিক জৈব চুম্বকত্ব (animal magnetism), ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতিতে হ্যানিম্যানের ছিল গভীর বিশ্বাস। তাঁর ধারণা ছিল স্বাস্থ্যবান শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি থেকেও ভেষজগুণ সম্পন্ন তেজ বেড়িয়ে আসে এবং অন্য কোন রোগীর দেহে ঢুকে রোগ নিরাময় করতে পারে। মৃত, আপাত মৃত, ব্যাক্তিকেও জৈব চুম্বকত্ব দিয়ে বাঁচিয়ে তোলা যায়। পুরাতন চিকিৎসা যে "mish mash of religion, magic and empirically acquired ideas and practices" (Henri Sygerist) ছিল, হ্যানিম্যানিয় হোমিওপ্যাথিতে তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ্য করা যায়। বর্তমান লেখক আন্তর্জাতিক একটিও প্রামান্য বই বা রচনা বার করতে পারেনি যেখানে হোমিওপ্যাথিকে অপজ্ঞান ও বিভ্রান্ত না বলা হয়েছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস ও হোমিওপ্যাথি।

আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের শুরু অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকের রাসায়নিক সংযোজনের সূত্রাবলী ও ডালটনের পরমাণুতত্ত্ব (1803) আবিষ্কার থেকে। রসায়নের জন্মদাতা বলে পরিগণিত ল্যাভসিয়েরের সময় O, N, H, S, P,As,, Sb, Cu, Fe, Au, Ag সহ মাত্র তেইশটি মৌলিক পদার্থ জানা ছিল। ল্যাভসিয়েরের মত বিরাট প্রতিভার লোকও চুণ, ম্যাগনেসিয়া, (MgO) এলুমিনা (Al_2C_3), বালি (SiO_2), আলো, ক্যালোরিক, প্রভৃতিকে মৌলিক পদার্থ মনে করতেন। জৈব রসায়নের তখনো জন্মই হয়নি। যুগ এগিয়ে গেছে। তাই এখনকার যে কোন হাইস্কুলের ছাত্র ল্যাভসিয়েরের চেয়ে বেশী কেমিস্ট্রি জানে। সেখানে এখনকার হোমিওপ্যাথদের বিচারে হ্যানিম্যান বিরাট চিকিৎসক, মস্ত কেমিস্ট। আধুনিক জীব-ও শরীরবিদ্যার তখন প্রায় কিছুই ছিল না, তথাপি হ্যানিম্যান মস্ত চিকিৎসক এবং তাঁর রচনাসমূহ ধর্মগ্রন্থের মত হোমিওপ্যাথদের মধ্যে আজও চর্চিত, জীবন্ত। অথচ তখনকার অন্যান্য মহাবিজ্ঞানীরা ইতিহাসের পাতায় যে যার স্থান নিয়েছেন। **হ্যানিম্যান নতুন এক কুসংস্কার তৈরী ও প্রচার করে সাফল্যের সঙ্গে গ্যালেনপন্থীদের পুরাতন কুসংস্কার দাবিয়ে সৌভাগ্যবান হয়েছিলেন।**

হ্যানিম্যানের আগেই দর্শন, রসায়ন ও শারীরবিদ্যায় এমন বেশকিছু অগ্রগতি ঘটে যার ফলে পুরাতন বহু ধারণা ধ্বসে পড়ে। বার্নাল লিখেছেন (পৃঃ 646) : "চিকিৎসা দর্শনের মূলভিত্তি হিউমার তত্ত্ব রসায়ন ও জীববিদ্যার অগ্রগতিতে ভেঙ্গে পড়ে। অথচ উনবিংশ শতকের প্রথম পর্যন্ত এই শূন্যতায় কার্যকর নতুন কিছু আসে না। এর ফলে এমন এক যুগ

আসে যেখানে নানা উদ্ভট তত্ত্ব (wild speculation) ও পদ্ধতি গঠন চলতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় মেসমারের (1734-1815) জৈব-চুম্বকত্ব, গলের (c1800) ফ্রেনোলজি বিরাট জনপ্রিয়তা পায়। অথচ এরা অনুপ্রাণিত আত্মপ্রত্যয়ী হাতুড়ের বেশী ছিল না। হ্যানিম্যান ও হোমিওপ্যাথি এই যুগেরই ফসল (c1800 । হ্যানিম্যান পুরাতন ও পরিত্যক্ত আত্মার তত্ত্বকে জীবনীশক্তি বা ভাইটাল ফোর্স, কবিরাজদের ধাতু ও প্রাচীন গ্রীকদের হিউমার তত্ত্বকে মিয়াজম, দৈবশক্তিকে ওষুধের তেজ বা পোটেন্সি—এইসব কথার আড়ালে রেখে নিজের মনগড়া এক চিকিৎসাশাস্ত্র তৈরী করেছিলেন যার সবটাই আধুনিক বিজ্ঞান বিরোধী। হ্যানিম্যানের চিকিৎসা চিন্তায় অজ্ঞেয় ঈশ্বরের বিশেষ প্রাধান্য, Creator, preserver of mankind, Benevolent Deity, Divine Grace প্রভৃতি কথার ছড়াছড়ি এবং তখনকার ভিন্নমতের চিকিৎসকদের এ্যালো-প্যাথ, ভ্রান্ত, পীড়িতের অনিষ্টকারী, বস্তুবাদী (materialist) ইত্যাদি বলে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। তিনি বলতেন বিজ্ঞান দিয়ে মানুষের দেহকে বোঝা যায় না, বোঝা কখনো সম্ভবও না।

আর একটা কথা বলেই শেষ করব। হোমিও বিতর্কে আধুনিক যুগ ও পুরাতন যুগের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য মনে রাখা উচিত। এই যুগের বিজ্ঞানে তথ্য—খাঁটি তথ্য - ও আইডিয়ার ভীষণ কদর। কোন পদ্ধতিতে, কোন ওষুধে অসুখ সারে—এটা যদি ঘটনা হয়, তবে তা বোঝা যাক বা না যাক ত দীর্ঘদিন অবহেলিত অনাদৃত থাকে না। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বিরাট পৃথিবীর শতসহস্র বছরের লক্ষলক্ষ সাধারণ অসাধারণ কর্মীদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সারসংকলনের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। তার সার্থক ও সফল প্রয়োগই কাম্য। জাদু ও দেববিশ্বাস সমৃদ্ধ উদ্ভট শাস্ত্র-রূপে পরিগণিত হোমিওপ্যাথির সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না, যা অন্তত কিছুটা আয়ুর্বেদের আছে।

নির্দেশিকা

1. S. Hahnemann : Organon of Medicine, 5th Ed. (1833) (includes changes of 6th Ed.), Translation and Editing by R. F. Dudgeon and William Boericke (2nd Indian Ed, 1970).

2. Sir James Frazer : The Golden Bough (Abridged Ed.), Macmillan & Co, 1956.

3. Microbiology : Ed. by Davies, Dulbecco, Eisen, Ginsberg & Wood, 2nd Ed, Harprer Internatsonal 1973.

4. J. D. Bernal : Science in History, Vols i—iv, 1969, Penguin.

5. P. P. Weiner (Ed): Dictionary of the History of Ideas, Charles Scribner's Sons, N. Y., 1973, Vol II (P, 395—407), Vol III (P 126 - 146).

6. Encyclopaedia Britannica, 1975 (15th Ed), 8 : 752, 10 : 793, 2 : 1026, 17 : 566.

7. H. C. Allen : Keynotes and Characteristics with Comparisons of Some of the Leading Remedies of the Materia Medica, 1967,

8. M. L. Tyler : Homeopathic Drug Practices, 2nd Ed, 1952.

9. Webster's Dictionary & Samsad English-Bengali Dictionary,

10. Science Today : June, 1981 (Letter by R.L. Jussal).

11. Joseph Jastrow : Error and Eccentricity in the Huan Beliefs, Dover, N.Y., 1935.

12 Man, Myth and Magic : Encyclopaedia of the Supernatural, Vol. 10 (Article on Homeopathy), Marshall Cavendish Corpn, N.Y., 1970.

13. Martin Gardner : Fads and Fallacies in the name of Science.

14. রাজশেখর বসু : ডাক্তারী ও কবিরাজী (পরশুরাম গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড)।

মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

With best compliments from

Elecdrolik Engineering Co.

Aurobinda Road

Ramrajatala, Howrah-4,

Manufacturers of hydraulic equipments.

দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী ঃ বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক (1907-66)

এই কিছুদিন আগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সেমিনার কক্ষে 'অধ্যাপক কোসম্বী : বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক'-শীর্ষক একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা এবং যাদবপুর বিজ্ঞান ক্লাব-এর যৌথ উদ্যোগ। সেদিন ওই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী সম্বন্ধে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে দেখা গেল ব্যাপক আগ্রহ। কোসম্বী এমনই এক বহুমুখী প্রতিভা যে তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক। প্রাথমিকভাবে অঙ্কের জগতের মানুষ হলেও ক্রমশ তাঁর জ্ঞানচর্চার আওতায় এসে পড়ে মুদ্রাবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব, ভারত-বিদ্যা, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সংস্কৃত-পাঠতত্ত্ব, প্রজনন-বিদ্যা বা জেনেটিক্স্। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে শুধু পড়াশোনা নয়, অজস্র প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তাঁর অধ্যয়ন ও জ্ঞানচর্চার কিছুটা আভাস দেওয়াই এই রচনাটির মূল লক্ষ্য।

পেশায় কোসম্বী ছিলেন অঙ্কের অধ্যাপক। বেনারস, আলিগড়,পুণে টি. আই. এফ. আর ও শেষে সি. এস. আই. আর-এর সঙ্গে অধ্যাপনা-গবেষণার কাজে তিনি দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে যে জিনিসটি দেখা যায়—জ্ঞানচর্চার জগতে একবার ঢুকে পড়ে স্বদেশ ও কাল-কে সম্পূর্ণ ভুলে থাকা—কোসম্বী ছিলেন তার এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর আবিষ্কৃত সূত্রগুলির বাস্তব প্রয়োগ এবং দেশের পরিস্থিতিতে তার উপযোগিতা সম্পর্কে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। তাছাড়াও তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তি আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী। এর জন্যে টি. আই. এফ. আর কর্তৃপক্ষ ও ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁর ভাবের অভাব ঘটেছিল। কিন্তু কোসম্বী তাতে দমেন নি। শেষ পর্যন্ত টি. আই. এফ. আর তাঁর সঙ্গে নতুন করে কাজের চুক্তি করতে অস্বীকার করে কারণ কোসম্বী নাকি অঙ্কের চেয়ে ভারতবিদ্যা নিয়ে বেশী মাথা ঘামাচ্ছিলেন। কথাটা অবশ্য একটুও সত্যি নয়। এই সময় তিনি মৌলিক সংখ্যা নিয়ে অনেক কটি লেখা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কোসম্বী তার জন্যে কোন আপস করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে কিঞ্চিৎ উগ্রভাষী, কিন্তু অত্যন্ত সৎ ও সমাজসচেতন বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি সর্বদাই স্মরণীয়।

1907 সালের 31 জুলাই গোয়ার কোসবেন-এ কোসম্বীর জন্ম। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু 1912 সালে পুণের নিউ ইংলিশ স্কুল-এ। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে 1918 সালে আমেরিকার কেমব্রিজ গ্রামার স্কুলে তিনি ভর্তি হন। তখন তাঁর পিতা বৌদ্ধ দর্শনে পণ্ডিত আচার্য ধর্মানন্দ কোসম্বী আমেরিকায় ছিলেন 'বিসুদ্ধিমগ্‌গ' সম্পাদনার কাজে। গ্রামার স্কুলে চমৎকার ফল করার পর মধ্যশিক্ষার জন্যে কোসম্বী কেমব্রিজের (ম্যাসাচুসেট্‌স্) ল্যাটিন হাই স্কুল-এ এবং সেখানে পড়াশুনা শেষে ভর্তি হলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে। তরুণ কোসম্বী ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চেয়ে অঙ্ক চর্চায় বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং অঙ্ক বিভাগের অধ্যাপক বিরকফ-এর পরিচালনায় তাঁর সে ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হলেন।

1924 সালের শেষ দিকে কোসম্বী মাকে দেখতে ফিরে আসেন ভারতে। সে-সময় তিনি ব্যস্ত থাকতেন বিভিন্ন ধরণের অঙ্ক নিয়ে। যেমন ঃ অবকলনীয় সমীকরণ (Differential equation), ক্ষেপণাস্ত্র-গতিবিদ্যা (Ballistics)।

স্নাতক-স্তরের পড়াশোনা শেষ করার জন্যে কোসম্বীকে আবার হার্ভার্ডে ফিরে যেতে হয়। হার্ভার্ডে শিক্ষাক্রমের শেষে তিনি পেলেন সর্বোচ্চ সম্মান সুম্মা-কুম-লদে। 1929 সাল নাগাদ পি. এইচ. ডি না করেই তিনি ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। কারণ তখন পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজারে চলছিল মন্দা। ফলে অ্যাকাডেমিক কিছু কাজ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল ছিল। হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ তাঁদের স্নাতকদের কাজের যোগ্য স্থান খুঁজে দিতে বেশ অসুবিধায় পড়েছিলেন। তাছাড়া হার্ভার্ডে পি-এইচ. ডি করতে কোসম্বীকে কিছুটা নিরুৎসাহ-ও করা হয়েছিল। তাই বাধ্য হয়েই কোসম্বী ফিরে আসেন ভারতে।

1929 সালেই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর অধ্যাপনা জীবন শুরু। এখনো পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, 1930 সালে 'দি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব্ ফিজিক্স' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর অঙ্ক সম্বন্ধীয় প্রথম প্রবন্ধ ঃ **Precessions of an Elliptical Orbit**। 1931 সালে 'প্রসিডিংস অব দি এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় **On a Genaralization of the Second Theorem of Bourbaki**; 1932 সালে তিনি **Path-space**-র ওপর কাজ শুরু করেন। এই সূত্রে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঙ্কবিদদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে, বিশেষ করে ই. কার্তাঁ এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে যাঁরা ওই একই বিষয়ে তখন কাজ করছিলেন। **Path-space**-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। যেমন ঃ 1933 সালে কার্তাঁর একটি অনুকূল মন্তব্য সহ প্রকাশিত হয় **Parallelism and path spaces**; 1934 সালে **Collineations in path-space**; 1936

সালে **Path spaces of Higher order**, 1940 সালে **Path-equation Admitting the Lorentz group** [1] এবং 1941 সালে **Path equation Admitting the Lorentz Group** [II]; 1949 সালে **Lie Rings in Path-space** ইত্যাদি। অঙ্কের আরো যে যে বিষয়ে তিনি কাজ করেছেন সেগুলি হল : অবকল বা অন্তরা জ্যামিতি, সম্ভাব্যতাতত্ত্ব ও সংখ্যায়ন [**Differential Geometry, Theory of Probability and Statistics**]; গাণিতিক বিশ্লেষণ [**Mathematical Analysis**] ও ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব [**Cosmogony**]।

1932 সালে একটি ফরাসি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বিদেশী ভাষায় প্রবন্ধ যার বিষয়বস্তু হল অন্তরা জ্যামিতি। ওই একই বছরে একটি জর্মন পত্রিকায় প্রকাশিত হল একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব [**Unified field theory**] সম্বন্ধীয় একটি লেখা। অন্তরা জ্যামিতি-র ওপর আর একটি গ্রন্থ **Differential Geometry of the Laplace Equation** প্রকাশিত হয় 1936 সালে 'জর্নাল অব দ্য ইণ্ডিয়ান ম্যাথামেটিকাল সোসাইটি'-তে। 1949 সালে কোসম্বী যখন প্রিন্সটন এর **Institute for Advanced Study** কর্তৃক আমন্ত্রিত হন তখন সেখানে আইনস্টাইনের সঙ্গে সম্ভাব্যতা-তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কিছু আলোচনা হয়। রাশিবিজ্ঞান-এ কোসম্বীর অবদান অনেক। এ-সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ : **The Geometrical Method of Mathematical Statistics, Statistics in Function Space** ইত্যাদি প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্রিকায়। বাস্তব সমস্যার ক্ষেত্রে রাশিবিজ্ঞানের প্রয়োগে কোসম্বী অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তিনি ভারতীয় জনসংখ্যা সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন। ক্রোমোসোম ম্যাপিং-এর ক্ষেত্রে একটি সূত্র কোসম্বী সূত্র নামেই পরিচিত। ভারতবর্ষে জন্মহার ও মৃত্যুহার বছরের কোন সময়ে বেশি বা কম থাকে এ ব্যাপারে এস. রাঘবচারির সঙ্গে তিনি একটি কাজ করেছিলেন এবং গবেষণা-লব্ধ ফলের ওপর ভিত্তি করে দুটি লেখা প্রকাশিত হয় : 1951 সালে **Seasonal Variations in the Indian Birth-rate** এবং 1954 সালে **Seasonal variations in the Indian Death-rate**। **Tensor Analysis** সম্বন্ধীয় তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের মধ্যে আছে 1939 সালে **The Tensor Analysis of Partial Differential Equations**, 1945 সালে **Parallelism in the Tensor Analysis of Partial Differential Equations** ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের ওপর একটি লেখা : **Path-geometry and Cosmogony** প্রকাশিত হয় 1936 সালে। কোসম্বীর অঙ্ক-সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধগুলি উল্লিখিত হল, বলা বাহুল্য এ-বিষয়ে আরো অনেক লেখা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

1939-40 সাল নাগাদ শুধু অঙ্ক নয়, আরও অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন কোসম্বী। এই সময় থেকেই তাঁর বহুমুখী কর্ম-ক্ষেত্রের সূচনা। ছাপ-মারা [**Punch marked**] মুদ্রার পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোসম্বী অনেক কিছু জানলেন। তাঁর এই তীব্র অনুসন্ধিৎসা ভারতে সৃষ্টি করল মুদ্রাবিদ্যা চর্চার নতুন যুগ। প্রাচীন মুদ্রাগুলির ওজন সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তিনি 1940 সালে মুদ্রাবিদ্যা বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ : **A Statistical study of the weights of the old Indian punch-marked coins** লিখলেন 'কারেণ্ট সায়েন্স' পত্রিকায়। তক্ষশীলার ভাণ্ডারে পাওয়া প্রাচীন মুদ্রা-গুলিতে যদিও কোন প্রাচীন কাহিনী বিবৃত নেই, তবু সেগুলি তক্ষশীলার একটি সুন্দর অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরে। এ-সম্বন্ধে তাঁর লেখাটি হল : **A Note on Two Hoards of Punch-Marked Coins Found at Taxila** (1940)। মুদ্রাবিদ্যা-সম্পর্কিত আরো অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' (ফেব্রুয়ারি, 1966) পত্রিকায় যেবার কোসম্বীর মুদ্রাবিদ্যা-বিষয়ক প্রামাণ্য লেখা **Scientific Numismatics** প্রকাশিত হয়, তখন কোসম্বীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংখ্যাটিতে কেবলমাত্র মুদ্রাবিদ্যা সংক্রান্ত লেখাই প্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি, অঙ্কের খেলা বিভাগে মার্টিন গার্ডনারের লেখাটিও ছিল মুদ্রার ধাঁধা নিয়ে।

মুদ্রাবিদ্যা থেকে তাঁর ভারতবিদ্যায় প্রবেশ বেশ মজার ব্যাপার। প্রাচীন মুদ্রাগুলিকে সময়ানুক্রমিক ভাবে সাজানোর পর তাঁর মাথায় প্রশ্ন জাগল : মুদ্রাগুলির ওপর আছে কোন রাজাদের ছাপ? ইতিহাসের উৎসগুলি আবার একে অন্যের সঙ্গে মেলে না। পুরাণ, বিবিধ বৌদ্ধ ও জৈন নথিপত্রগুলি অনেক সময় এক রাজাকেই বিভিন্ন নামে অভিহিত করে। তাই প্রাচীন নথিপত্র অধ্যয়ন মানেই সংস্কৃত ভাষার গভীরে প্রবেশ করা। ভর্তৃহরি-র 'সুভাষিতাবলী' কবিতাগুলির ওপর একটি নির্দিষ্ট পাঠ-সমালোচনার কাজ দিয়ে তিনি শুরু করলেন সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষা। ভর্তৃহরির দর্শন সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এবং টীকাকারদের ব্যাখ্যা যা ভর্তৃহরির নৈরাশ্য ও পরাজয়সূচক কবিতাগুলির সঙ্গে মেলে না –এই দিকটি দেখিয়ে কোসম্বী 1941 সালে ফার্গুসন কলেজ ম্যাগাজিনে লিখলেন : **The Quality of Renunciation In Bharthrari's Poetry**, 'বিদ্যার্থী'-এই ছদ্মনামে। কোসম্বীর নিজের ভাষায়, এইভাবে তিনি যেন ভারতবিদ্যার জগতে ছাদ ফুঁড়ে প্রবেশ করলেন।

অবশ্য এটাই ভারতবিদ্যা নিয়ে তাঁর প্রথম লেখা নয়। 1940 সালে 'এনালস অব দ্য ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনিস্টিটিউট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল : **The Emergence of National Characteristics amoug three Indo-European Peoples**। সাম্প্রতিক

ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর ঔৎসুক্য দেখা যায় এ-সময়ের একটি রচনায়: The Function of Leadership in a Mass Movement। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে কোসম্বীর কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায় তাঁর বিশ্বদর্শন মার্কস্‌বাদ-ভিত্তিক এবং বিজ্ঞান হিসেবে মার্কস্‌বাদকে তিনি সর্বদাই প্রয়োগ করতে চান। এ-বিষয়ে তাঁর অনেকগুলি লেখার একটি হল Revolution and the progress of Science।

সংস্কৃত পাঠ-অধ্যয়ন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রেও কোসম্বীর অবদান অনেক। 1945 সালে আনন্দাশ্রম সংস্কৃত সিরিজ-এ পণ্ডিত কে. ভি. কৃষ্ণমূর্তির সহযোগিতায় তিনি সম্পাদনা করেন The Satakatrayam of Bhartrhari with Comm. of Ramasri। ভর্তৃহরি-সম্পর্কিত আরো দুটি সম্পাদিত গ্রন্থ হল: 1946 সালে ভারতীয় বিদ্যা সিরিজ-এ The Southern Archetype of Epigrams Ascribed to Bhartrhari এবং 1948 সালে সিংহী জৈন সিরিজ-এ The Epigrams Attributed to Bhartrhari—যা সংস্কৃত পাঠ সমালোচনার একটি আদর্শ নিদর্শন। বন্ধু ডানিয়েল এইচ. এইচ. ইন্‌গল্‌স্‌-এর প্রস্তাব অনুযায়ী আর এক বন্ধু বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলের সহযোগিতায় তিনি সম্পাদনা করেন: The Subhasitaratnakosa of Vidyakara (1957)। বইটি প্রকাশিত হয় হার্ভার্ড ওরিয়েন্টাল সিরিজ-এ। এছাড়া 1952-য় 'জার্নাল অব ওরিয়েন্টাল রিসার্চ' পত্রিকার ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদিত The Cintamani-saranika of Desabata।

1940 সালের পর থেকে ভারতের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, মুদ্রা-বিদ্যা, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র লেখা একের পর এক প্রকাশিত হতে থাকে। এখানে কয়েকটি রচনার উল্লেখ করি। 1943-এ Race and Immunity in India এবং Soviet Victory and the World Revolution, 1944-এ Caste and Class in India; 1948-49-এ The Avatara Syncretism and possible sources of the Bhagvad-Gita; 1949-এ Marxism and Ancient Indian culture; 1951-য় Urvasi and Pururavas এবং Imperalism and Peace; 1952-য় Science and Freedom; 1954-য় Notes on the Class Structure of India; 1957-য় Dhenukakata, 1958 The Text of the Arthasastra; 1959-এ Primitive Communism, 1960-এ At the Cross roads: Mother Goddess Cult Sites in Ancient India; 1963-তে Combined Methods in Indology। কোসম্বী এক সময় শুধুছাপা বা হাতেলেখা পুঁথির ওপর ভরসা না করে নিজেই কিছু নৃতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা শুরু করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রবন্ধটি হল: Pierced Microliths from the Western Deccan Plateau। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে National Defence Academy-র প্রত্নতাত্ত্বিক সংঘ গঠনে তিনি সহযোগিতা করেন ও সেখানকার ছাত্রদের প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে ব্যবহারিক কিছু শিক্ষাও দেন।

কোসম্বীর পূর্ণাঙ্গ বই দুটি। প্রথম বই An Introduction to the Study of Indian History (Popular Book Depot. Bombay, 1956) ভারতীয় ইতিহাস লেখনের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসকে যথার্থ ব্যাখ্যা করার অন্যতম পথিকৃৎ। বইটির বহু অনুকূল আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায়। দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline (Routledge & Kegan Paul, London, 1965) কোসম্বীর পরিণত ভারতচিন্তার ফসল। বইটি অন্যান্য ভাষায় (যেমন জর্মন, ফরাসি ও জাপানিতে) অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আগের সমস্ত লেখাগুলিকে কোসম্বী এই বইটির পাদটীকা বলে চিহ্নিত করেন। এই দুটি পূর্ণাঙ্গ বই ছাড়া আরো দুটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়: Exasperating Essays, Exercise in the dialectical Method (People's Book House, Poona, 1957) ও Myth and Reality: Studies in the Formation of Indian Culture (Popular Prakashan Bombay, 1962)।

কোসম্বীর জীবন সংক্রান্ত আর দু-একটি তথ্য এখানে বলে নিই। তিনি 1934 এ রামানুজন স্মৃতি পুরস্কার ও 1947-এ একটি বিশেষ হোমি ভাবা পুরস্কার লাভ করেন। 1948-49 সাল নাগাদ ইউনেসকোর ফেলো নির্বাচিত হন আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ইলেকট্রনিক গাণনিক যন্ত্র-গবেষণার জন্যে। 1955 সালে সোভিয়েত এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর আমন্ত্রণে রাশিয়া যান। বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের কাজে তিনি চীনেও যান। 1965 সালে সি. এস. আই. আর তাঁকে Scientist Emeritus নির্বাচিত করেন।

1962 সালের শেষে টি. আই. এফ. আর ছাড়লেন কোসম্বী। এ-সময়ে শরীরও নানা কারণে ভেঙ্গে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার আগ্রহ ছিল অম্লান। হঠাৎ একদিন 1966-র 24 জুন তাঁর ঘুম আর ভাঙল না। চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন 59 বছর বয়সী ভারতের এই বরেণ্য বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক।

স্বপন সোম

পরিচিতি ঃ স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারো (1826-1910)

'মহান স্টানিসলাও ক্যানিজারো যখন একজন রসায়নবিদ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করতে যাবেন এবং তার জন্য যখন তিনি পুরোমাত্রায় উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন তখনই ঘটল 1848 সালের ঘটনা ও স্থির করে দিল তাঁর ভবিষ্যৎ। তিনি তাঁর ল্যাবরেটররি দরজা বন্ধ করে স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলেন বন্দুক। আচার্যপ্র ফুল্লচন্দ্র

[বি-ও-ব'র জুলাই-আগস্ট 1981 সংখ্যায় ক্যানিজারো সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উদ্ধৃতিটি দেখে বেলঘরিয়া থেকে শ্রীশঙ্কর ভৌমিক লিখেছিলেন "গত পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 'এক বাঙালী রসায়নবিদের আত্মচরিত থেকে' শীর্ষক লেখাটিতে 'স্ট্যানিসলাও ক্যানিজারো' নামে একজন রসায়নবিদের নামোল্লেখ রয়েছে। আমি ঐ বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। যদি আপনাদের পরবর্তী কোন সংখ্যায় এ সম্পর্কে লেখা দেন তাহলে ভাল হয়।" শ্রী ভৌমিকের অনুসন্ধিৎসার সূত্র ধরে এই পরিচিতি।

সঃ মঃ, বি-ও-বি]

বিখ্যাত রসায়নবিদ স্ট্যানিস্লাও ক্যানিজারোর জন্ম হয় ইতালির অন্তর্গত সিসিলিতে। স্কুলের শিক্ষা শেষ করে তিনি ডাক্তারী পড়েন, তারপর বছর তিনেক শারীরবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর প্রত্যয় হয় যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলি মূলত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তিনি রসায়নের প্রতি আকৃষ্ট হন। 1845-এ তিনি বিখ্যাত রসায়নবিদ র‍্যাফায়েল পিরিয়ার সাথে পরিচিত হন এবং পিসায় তাঁর ল্যাবরেটারী অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে দু বছর কাজ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রসায়নে পড়াশুনা চালিয়ে যান। মোটামুটিভাবে 1851 থেকে 1871 পর্যন্ত ইটালির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন।

রসায়নের ছাত্ররা ক্যানিজারোর নামের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁর নামাঙ্কিত একটি বিখ্যাত রসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে (**Cannizaro's Reaction**)। এই বিক্রিয়া অনুযায়ী বেনজালডিহাইড ও পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় একই সঙ্গে জারণ ও বিজারণ সংঘটিত হয়ে বেনজাইল অ্যালকোহল ও বেনজয়িক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিজ্ঞানে ক্যানিজারোর এর চেয়েও মৌলিক অবদান হল অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের সংশোধিত রূপায়ন। অ্যাভোগাড্রো তাঁর বিখ্যাত প্রকল্পে বলেছিলেন—তাপ ও চাপ সমান থাকলে সম-আয়তন যে কোন গ্যাসে সমান সংখ্যক ক্ষুদ্রতম কণা থাকবে। এই ক্ষুদ্রতম কণা নিয়ে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি হয়। অনেকেই ধরে নেন এই কণা হ'ল পরমাণু। ক্যানিজারোই ব্যাখ্যা করে দেখান যে এই 'কণা' পরমাণু নয় অণু (1858)। তাঁর কাজের ফলেই অণু ও পরমাণুর পার্থক্য স্পষ্ট হয়। রসায়নশাস্ত্র তথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পারমাণবিক গুরুত্বের সংজ্ঞাও নির্দিষ্ট করেন তিনি। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে স্যানটোনিন **Santonin**-এর গঠনপ্রকৃতি নির্ণয় অন্যতম। 1891 খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে কোপ্‌লে মেডেল দিয়ে সম্মানিত করে।

উনিশ শতকের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্যানিজারো অবশ্যই একটি বিশিষ্ট স্থান পেতে পারেন, কিন্তু অন্যান্য সামাজিক ঘটনায় তাঁর ভূমিকা তাঁকে আরো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। 1815 খৃষ্টাব্দে প্রথম নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনা চুক্তির উপহার হিসেবে ইটালি আটটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয়। সিসিলি অন্তর্ভুক্ত হয় কুখ্যাত বুরবোঁ শাসিত নেপল্‌স্-এর। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদীরা এতে হয়েছিলেন চরম বিক্ষুব্ধ। তিন দশক ধরে তাঁরা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন। অবশেষে 1848-এর জানুয়ারীতে নেপল্‌সে ঘটল অভ্যুত্থান। যুবক ক্যানিজারো তখন ছুটি কাটাতে তাঁর জন্মশহর পালের্মোয়। যে পালের্মোয় অভ্যুত্থান দমনের জন্য রাজা দ্বিতীয় ভার্দিনান্দ চালালেন প্রজাদের উপর অবিরাম বোমাবর্ষণ, যার জন্য তিনি আখ্যা পেয়েছিলেন বোমা-রাজা। সে যাহোক, ক্যানিজারো সে সময় ভুলে গেলেন পিসার ল্যাবরেটারীর কথা, গবেষণার কথা। সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার হিসেবে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বিপ্লব সফল হল—ক্যানিজারো সিসিলি পার্লামেন্টের সদস্যও মনোনীত হলেন। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী রাজশক্তি 1849-এর গোড়াতেই আবার ক্ষমতা পুনর্দখল করলে তিনি ঘোষিত হলেন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে। শেষ পর্যন্ত তিনি আশ্রয় নিলেন পারীতে। সেখানে বছর দেড়েক অবস্থানকালে শেভ্রই (**Chevreul**)-এর ল্যাবরেটারীতে তিনি সায়ানামাইড নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেন। 1851-য় তাঁর আবার ডাক পড়ল দেশে ফেরার। আলেকজান্দ্রিয়ার ন্যাশনাল কলেজে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের অধ্যাপনার কাজের আহ্বান পেলেন। কিন্তু প্রথমে তা তিনি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। পরে তাঁর শিক্ষাগুরু ও বন্ধু পিরিয়া'র নির্বন্ধে তিনি পদটি গ্রহণ করেন। শুরু হয় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন গবেষণা ও অধ্যাপনার জীবন। 1860 সালের মধ্যে অবশ্য ইতালির খণ্ডরাজ্যগুলি প্রায় সবই একত্রিত হয়। মূল ভূমিকা নেন সার্দিনিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজা দ্বিতীয় ইমানুয়েল ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ক্যাভুর। গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বে নেপল্‌স্ ও সিসিলি পরে আবার বুরবোঁ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ইতালির সঙ্গে যোগ দেয়। ক্যানিজারোর অন্যতম স্বপ্ন এভাবে কিছুটা সফল হয় এবং তিনি ক্রমশ বেশী বেশী করে সরকারী কাজে অংশগ্রহণ করেন। পুনর্গঠিত নবীন ইতালির বিজ্ঞানশিক্ষার রূপকারদের তিনি এক পথিকৃৎ। **রবীন মজুমদার**

পরমাণু অস্ত্রবিরোধী বিক্ষোভ ঃ দেশে দেশে

সম্প্রতি ইউরোপের মানুষের মধ্যে নতুনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এক আতঙ্ক। তাঁরা অনুভব করছেন পারমাণবিক যুদ্ধের এক নিঃশব্দ মহড়া। এই পুঞ্জীভূত আতঙ্ক সম্প্রতি বিক্ষোভের আকারে ফেটে পড়েছে ইউরোপের শহরে শহরে। এবং ছড়িয়ে পড়ছে বাইরেও।

লণ্ডন ঃ গত 24 শে অক্টোবর লণ্ডনের হাইড পার্কে পরমাণু অস্ত্র বিরোধী এক বিক্ষোভ সমাবেশে প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এটি হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে লণ্ডনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ। মিছিলে বিভিন্ন পোস্টারের মধ্যে শিশুদের হাতে ধরা ছিল আগামী দিনে তাদের পৃথিবীর মাটিতে তাদের সুস্থভাবে বাঁচতে দেবার অঙ্গিকার দাবী করে পোস্টার। মিছিলে অনেকের পরনে ছিল বোমার থেকে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত পোষাক, গ্যাস মুখোস ইত্যাদি। এই দৃশ্য অনেককেই মনে করিয়ে দিয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা।—সারাক্ষণই এই মিছিলের ওপর নজরদারী করতে মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল পুলিশী হেলিকপ্টার।

রোম ঃ একই দিনে রোমেও অনুষ্ঠিত হয় অনুরূপ মিছিল। দু'লক্ষেরও বেশী বামপন্থী, ট্রেড-ইউনিয়নকর্মী এবং যুদ্ধবিরোধী গোষ্ঠীর সদস্যরা শান্তি ও পরমাণু নিরস্ত্রীকরণের দাবীতে এক মিছিলেরসামিল হন। উদ্যোক্তারা আমেরিকা এবং রাশিয়ার অস্ত্রমজুতের তীব্র সমালোচনা করেন।

প্যারিস ঃ এর পরের দিন অর্থাৎ 25 শে অক্টোবর প্যারিসের মানুষও নেমে পড়ে পথে—একই উদ্দেশ্যে। নিরস্ত্রীকরণের দাবীতে এবং ন্যাটোজোটভুক্ত দেশগুলিতে আমেরিকার অস্ত্রসজ্জার আধুনিকীকরণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এই বিক্ষোভ। সেখানকার যুব-ছাত্র, শ্রমিক এবং ফরাসী কমুনিস্ট পার্টির সদস্য মিলে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত মানুষ সামিল হন এই মিছিলে।

ব্রাসেলস্ ঃ একই দিনে অনুরূপ দাবীর ভিত্তিতে ব্রাসেলসেও অনুষ্ঠিত হয় এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল।

• •

এবং বোম্বাই ঃ এর কিছুদিন আগে গত 2 শে আগস্ট বোম্বাই-এর আমেরিকান কনসুলেটের সামনে এক বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়—আমেরিকার নিউট্রন-বোমা প্রস্তুতের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবং সারা বিশ্বে নতুন করে যুদ্ধের জিগির গড়ে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। মহারাষ্ট্রের তিন বামপন্থী দল যথাক্রমে সি. পি. আই, সি. পি. আই (এম) এবং কৃষক ও শ্রমিক দলের সদস্যরা ছিলেন এর উদ্যোক্তা।

[সূত্র ঃ 25 ও 26 শে অক্টোবর'81র স্টেট্‌স্‌ম্যান, 26 শের সত্যযুগ ও 13 ই সেপ্টেম্বরের পিপলস্ ডেমোক্রাসি]

আমরা সমগ্র বিজ্ঞানকর্মীবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে ধিক্কার জানাই

সেইসব যুদ্ধবাজদের

যারা কেড়ে নিতে চায় মানুষের বাঁচার অধিকার। **নিজস্ব প্রতিবেদক**

মন্তব্য ঃ গবেষণা-গবেষক-শিক্ষক

গবেষণা, বিশেষত বিজ্ঞান গবেষণা ক্বচিৎ কখনও সংবাদপত্রে স্থান পায়। কিছুদিন আগে দেখা গেল কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিশিষ্ট এক সংবাদপত্রে এক সাংবাদিকের একটী প্রতিবেদন যাতে বলা হয় যে আজকাল ভাল ছাত্র আর বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হ'চ্ছে না চাকরী না জুটলে মোটামুটি ভাল স্কলারশিপের লোভে অপেক্ষাকৃত খারাপ ছাত্ররা গবেষণায় ভিড় করে এবং তাদের ধান্দাই হ'ল একজন নামকরা শিক্ষকের ছত্রছায়ায় একটি ডিগ্রী হাতিয়ে নেওয়া (স্টেট্‌স্‌ম্যান 19-20 অক্টোবর, 1981)। স্বাভাবিকভাবেই এমন একটি প্রতিবেদন সম্পর্কে তরুণ গবেষক মহলে সাধারণ প্রতিক্রিয়া হ'ল এর ঠিক উল্টো ঃ বিজ্ঞান গবেষণায় ভাল ছাত্রের অভাব নেই বরং শিক্ষকতার মানই নিম্নগামী। ঠিক এ ধরনেরই একটি বক্তব্য পাওয়া গেল উক্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে লেখা একটি চিঠিতে (স্টেট্‌স্‌ম্যান 29-30 অক্টো)।

মনে পড়ে, বছর কুড়ি আগে ইংল্যাণ্ড থেকে আসা এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ভারতপ্রেমী—হ্যালডেন ; মন্তব্য—করেছিলেন ভারতে প্রবীনরা তরুণ গবেষকদের হিংসা করেন, তরুণদের মৌলিকত্বে আদৌ উৎসাহ দেন না, এবং তাদের গবেষণার ফসল চুরি করেন (Science and Indian Culture - J.B.S Haldane, New Age, P. 21)। তাঁর আরও মন্তব্য, ভারতীয় বিজ্ঞানের একটি দুঃখজনক বৈশিষ্ট্যই হ'লতরুণ কর্মীদের নানাভাবে উৎপীড়ন (ঐ পৃঃ 22)। স্টেট্‌স্‌ম্যানের মূল প্রতিবেদনটি পড়লে হ্যালডেন নিশ্চয়ই খুশী হ'তেন এই ভেবে যে এদেশে ইতিমধ্যে ছবিটা উল্টে গেছে।

আসলে এই পারস্পরিক দোষারোপ একটি নিষ্ঠুর সত্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করছে—দুপক্ষের বক্তব্যেই সত্য আছে, নীট ফল বিজ্ঞান গবেষনার মৃত্যু। এ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখা খুবই জরুরী। কিন্তু গবেষণাই যেখানে দিকদিশাহীন, গভীর অনুধ্যানের বিষয় হিসেবে গন্য হয় না, সেখানে গবেষণার উপর গবেষণার উৎসাহ দেখাবে কে ?

তবুও যদি অভিযোগগুলোর তুলনামূলক গুরুত্ব বিচার করা যায় তবে বলতেই হয়, এখনও অধিকাংশ তরুণই গবেষণা করার মানসিকতা নিয়েই গবেষণাগারে আসে। কিন্তু কালক্রমে তারা দেখে বড়রা, শিক্ষকরা তাদের উৎসাহ, উদ্যোগ মৌলিকত্বের কোন দাম তো দেনই না, উপরন্তু কথায় কথায় তাঁদের নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা চাপিয়ে দেন, বিনা দোষে বা সামান্য ত্রুটিতেই ল্যাবরেটারী থেকে গবেষককে বিতাড়িত করেন, গবেষণার কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা দেবার সময় পান না, কিন্তু পেপারের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ দেখান, এমনকি ছাত্রকে ফাঁকি দিয়ে শুধু নিজের নামে পেপার ছাপাতে বা কোন আলোচনাচক্রে পড়তে দ্বিধা করেন না; নিজের পদ ও আয়ের সম্পর্কে অতিসচেতন, ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে যেন তেন প্রকারেণ খুশী রাখতে ব্যাগ্র, অধীনস্থ গবেষকদের সিনেমা-থিয়েটার-ট্রেনের টিকিট কেটে দেবার অনুরোধ করা, কখনও বা টাকাটাও দিতে ভুলে যাওয়া—দেখতে দেখতে একসময় সয়ে যায়, ব্যতিক্রম বাদে তরুণরাও অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, অঙ্গীভূত হ'য়ে যায় 'সিস্টেম' এর বলছিনা সর্বদাই এমন হয়, কিন্তু হয়।

আর বিশ্ববিদ্যালয়? —যাঁরা গবেষণায় সাফল্যের ছাপ মারেন, প্রার্থীকে ধন্য করেন ডিগ্রী দিয়ে তাঁদের কৃতিত্বও কম নয়। গবেষণার কাজে সহায়তা করতে পারুন নাই পারুন প্রতি পদে বাগড়া দিতে তাঁদের জুড়ি নেই। থিসিস জমা দেবার পর দুবছর তো অতি সাধারণ ব্যাপার, অনেক সময় তিন, চার পাঁচ বা ততধিক বছরও তাঁরা পার করে দেন ফলাফল জানাতে! থিসিসের কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন যখন সব সময় সন্দেহের ঊর্দ্ধে নয়, তখন সংবেদনশীল তরুণ গবেষকের গবেষণা মাথায় উঠতে কতক্ষণ?

নিজস্ব প্রতিবেদক

জানবার কথা। ফিউশন রিয়্যাক্টর বানানোর অসুবিধা কোথায়?

একটি নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনগুলি পরস্পরের সঙ্গে কত দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে তার সূচক রাশিটিকে বলা হয় স্পেসিফিক বাইণ্ডিং এনার্জি (সংক্ষেপে এস-বি-ই)। এস-বি-ই কম হওয়ার অর্থ নিউক্লিয়াসটি অপেক্ষাকৃত আল্‌গা গঠনের। এখন, খুব হাল্কা নিউক্লিয়াসগুলির এস-বি-ই আর একটু ভারী নিউক্লিয়াসগুলির তুলনায় কম। তাই দুটি হাল্কা নিউক্লিয়াস জুড়ে গিয়ে যদি একটি অপেক্ষাকৃত ভারী নিউক্লিয়াস গঠন করে তবে সেই 'ফিউশন' বা সংযোজন প্রক্রিয়ায় কিছু শক্তি বেরিয়ে আসে। হাল্কা নিউক্লিয়াসগুলির মোট বন্ধনী শক্তি আর ভারী নিউক্লিয়াসটির বন্ধনীশক্তির পার্থক্যই এই শক্তির উৎস। সূর্য থেকে যে শক্তি বিকীরিত হয়ে পৃথিবীতে আসে তার উদ্ভব এই ফিউশন থেকে। ফিউশনের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান সুবিধে হল, খুব কম ওজনের জ্বালানী থেকেই প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এখন পর্যন্ত যেসব পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদন হয় তার মধ্যে 'ফিসন' প্রক্রিয়ায়ই সব চাইতে কম ওজনের জ্বালানী থেকে বেশী শক্তি পাওয়া যায়। ফিউশনে জ্বালানীর ওজন লাগবে আরো কম।

এক গ্রাম ইউরেনিয়াম 235 থেকে ফিসন প্রক্রিয়ায় 22 হাজার কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তি পাওয়া যায়। আর এক গ্রাম ডয়টেরন (একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন বিশিষ্ট নিউক্লিয়াস, এটি ভারী জলে থাকে) থেকে ফিউশন প্রক্রিয়ায় পাওয়া যায় এক লক্ষ ষাট হাজার কিঃ ওঃ ঘঃ। ফিউশনের আর একটি সুবিধা হল, এতে তেজস্ক্রিয়তার বিপদ কম। অবশ্য ফিউশন প্রক্রিয়ায় যে সব দ্রুতগামী নিউট্রন বেরোয় সেগুলি যথেষ্ট বিপজ্জনক হতে পারে।

এখন, সাধারণ অবস্থায় হাল্কা নিউক্লিয়াসগুলি পরস্পরের সঙ্গে জুড়তে চাইবে না, কারণ নিউক্লিয়াসগুলির চার্জ বা আধানের জন্য এরা একে অপরকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়। এদেরকে এই বিকর্ষণী বাধা ডিঙ্গিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন করতে হলে প্রচণ্ডরকম উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন। এই উচ্চ তাপমাত্রায় নিউক্লিয়াসগুলি যে প্রচণ্ড গতিশক্তি পায় তাতে সম্ভব হয় পরস্পরের ভিতরকার বিকর্ষণ অতিক্রম করা। ডয়টেরনকে দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে নিউক্লিয়াসগুলি এত ঘন ঘন একে অন্যের সঙ্গে ধাক্কা খায় যে ফিউশন বিক্রিয়া ঘটে যথেষ্ট মাত্রায়। তবে এত বেশী তাপমাত্রায় পদার্থের পরমাণুগুলি থেকে ইলেকট্রনগুলি বিযুক্ত হয়ে পদার্থকে প্লাজমা দশায় নিয়ে যায়, অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। কিন্তু প্লাজমায় চার্জযুক্ত গতিশীল কণিকাগুলির ভিতর যে ক্রিয়া হয় তার দরুণ প্লাজামা অতি দ্রুত তার আকৃতি হারিয়ে স্থির দশা থেকে অস্থির দশায় চলে যায়। বিশেষত উঁচু তাপমাত্রায় প্লাজামার এই অস্থিরতা বেড়ে যায় খুব বেশী মাত্রায়।

এখন, ফিউশন থেকে শক্তি পেতে হলে লসনের সর্ত নামে একটি সর্ত সাধিত হতে হয়। সর্তটি হল, প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ইলেকট্রনের সংখ্যা (n) আর প্লাজামা যত সেকেণ্ড সময় ধরে স্থির দশায় থাকছে (t), এই দুইয়ের গুণফলকে অন্তত 10^{14} বা তার বেশী হতে হবে। একমাত্র তখনই প্লজেমাকে গরম রাখতে যে হারে শক্তি সরবরাহ প্রয়োজন তার চাইতে বেশী হারে শক্তি ফিউশন প্রক্রিয়ায় মুক্ত হবে। এখন পর্যন্ত প্রযুক্তির যতটা অগ্রগতি হয়েছে তাতে এই সূচক রাশিটিকে অতটা উঁচু মানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ, প্লাজমার অস্থিরতা কমানো সম্ভব হয় নি যথেষ্ট মাত্রায়। তবে গত কয়েক বছরে এ ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে প্রভূত পরিমাণে। লসনের সর্তের সূচক রাশিটির মান 10^{13}এর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ফলে 'ফিউশন রিয়্যাক্টর' এখন প্রযুক্তিবিদ্যার নাগালের অনেকটা কাছে চলে এসেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে মানুষের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে এই 'ক্ষুদে সূর্য'।

উদয়ন বসু

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

রিপোর্ট

বসু বিজ্ঞানমন্দির ঃ সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা

জগদীশচন্দ্র বোসের প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দির কলকাতার তথা ভারতের একটি স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে চালিত হয়, যদিও পরিচালনার ব্যাপারে এটি একটি অটোনমাস প্রতিষ্ঠান। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মীদের একটি স্বীকৃত সংগঠন আছে যাকে সংক্ষেপে BIEA বলা হয়। মন্দিরের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ন্যস্ত আছে একটি কাউন্সিলের উপর যেখানে BIEAএর প্রতিনিধি নেই। তাছাড়া বহুদিন ধরে বিজ্ঞান মন্দিরের কর্মীদের কোন **Service Rule (SR)** ছিল না। BIEA-এর দাবী-দাওয়ার মধ্যে প্রধান ছিল কাউন্সিলে প্রতিনিধি গ্রহণ এবং একটি সর্বজন-গ্রহণযোগ্য **Service Rule** তৈরী করা। এ নিয়ে বহুদিন এবং বহুবার ডিরেক্টর এবং কাউন্সিলের সভ্যদের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ SR চালু করতে সচেষ্ট হন এবং এ নিয়ে BIEA-এর প্রতিনিধিদের সাথে প্রাথমিক আলোচনা করেন। কিন্তু পরে দেখা গেলো যে কর্তৃপক্ষ একটি SR তৈরী ক'রে **back date** দিয়ে (**with retrospective effect**) কাউন্সিলে পাশ করিয়ে কর্মীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এই SR-এর অনেক ধারাকে BIEA মর্কীদের গনতান্ত্রিক অধিকার এবং স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে। এ বিষয়ে যখন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা চলছে তার মধ্যেই কর্তৃপক্ষ **retrospective effect** দিয়ে SR চালু করে। BIEA-এর প্রতিবাদ জানায় এবং চাপিয়ে দেওয়া SR-কে সংশোধন না ক'রে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। BIEA-এর তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে কাজের বিরতির সময় শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল বিক্ষোভ জানায়।

কর্তৃপক্ষ কাউন্সিলে BIEA এর প্রতিনিধি গ্রহণে রাজী না হয়ে একটি **Joint consultative committee (JCC)** গঠন করার প্রস্তাব দেয়। ঠিক হয়, এই JCC কর্তৃপক্ষের মনোনীত ব্যক্তিদের এবং BIEA-এর প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে এবং কর্মচারীদের দাবী দাওয়া বিবেচনা করে কাউন্সিলে তাদের **recommendation** জানাবে। BIEA পরীক্ষা-মূলকভাবে এই JCC-তে অংশগ্রহণে রাজী হয়।

গত বছর খানেক ধরে কর্তৃপক্ষ একটি আদেশ জারী করেন যে বিকেল ৫টার পর বিজ্ঞানমন্দিরের কর্মী নন এমন কেউ বিজ্ঞানমন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারবেন না। একমাত্র Head/Officer দের অনুমতি পেলে **security** বিকেল 5টার পর ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেবে। কিন্তু এই **officer** বলতে কাদের বোঝায় কর্মীরা তা জানেন না। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের একটি নিয়ম অচল। এটি একটি আমলাতান্ত্রিক নিয়ম। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অনেক প্রাক্তন গবেষককর্মী এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের গবেকরা নানা প্রয়োজনে সন্ধ্যাবেলায় গবেষণাগারে আসেন। ঠিক যেমন বিজ্ঞান মন্দিরের অনেক কর্মী গবেষণা কাজের প্রয়োজনে বিকাল 5টার পর অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে বাধ্য হন। কাজেই এই নিয়ম অতিথিদের শুধু হেনস্থা করার জন্যই তৈরী। গত তিন দশক ধরে প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের নিয়ম না থাকায় কোন অসুবিধা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের **academic** ও **non-academic** কর্মীরা এই নিয়ম পছন্দ করেন নি। **Reseach Scholar**-রা এই নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

কিছুদিন আগে BIEA-এর কার্যকরী সমিতির কর্মীরা JCC গঠনের নিয়মকানুন, সুবিধা, অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি সভা ডাকেন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য অন্য প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান। এই সভা ৫টার পর অনুষ্ঠিত হয়। পরে **Security**-এর অভিযোগে কর্তৃপক্ষ 5 টার পর বাইরের লোক মন্দিরে প্রবেশ করানোর অভিযোগে BIEA-এর তিনজন কর্মীর উপর **charge-sheet** দেন এবং BIEA-কে **derecognise** করা হবে না কেন কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন। BIEA চিঠির মারফত এবং মন্দিরের কয়েকজন প্রফেসর ও সিনিয়র কর্মী এই ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নেবার জন্য ডিরেক্টরের কাছে প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু ডিরেক্টর অনোমনীয় মনোভাব দেখান।)

তারপরই ঘটলো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ডিরেক্টর **2** জন প্রফেসর, 4 জন রিডার, 1 জন স্কলার এবং 1 জন কর্মীকে চিঠি দিয়ে তাদের ব্যক্তিগতভাবে অপমান করবেন, বিজ্ঞান মন্দিরকে ধ্বংসের মুখে টেনে আনার অভিযোগ তোলেন এবং হুমকি দেন এদের বিরুদ্ধে পদাবনতির, পদত্যাগ পত্র দাখিলের এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করবেন কাউন্সিলের কাছে। এমন কি একজন স্কলারের **Scholarship** পাওয়ার আবেদন যাতে নাকচ হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য **Scholarship sponsoring authority** কে এই মর্মে চিঠি লেখার হুমকি দেখান যে ঐ স্কলারকে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে স্থান দেওয়া হবে না।

এই সমস্ত ঘটনার আগে বা পরে প্রতিষ্ঠানে এমন কোন গণ্ডগোল বা ঘটনা ঘটেনি যা থেকে এই ধরনের কিছু মারাত্মক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। আগেও প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম স্বাভাবিক চলছিলো এবং এখনও চলছে।

বিজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত কর্মীরা একযোগে আবেদন জানিয়েছেন ডিরেক্টর বা কাউন্সিল যেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে অচল অবস্থার সৃষ্টি না করেন ও তারা যেন কর্মীদের সাথে আলোচনা করে সব মিটিয়ে নেন। কর্মীরা বিশ্বাস করেন সমস্ত কিছুই আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব।

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের কর্তৃপক্ষের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার জন্য 'জ্যাকারি'র আহ্বানে গত 15ই জানুয়ারী সাহা ইন্‌স্টিটিউটে এক বিশাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়

নিজস্ব প্রতিবেদক

Registration No. R. N. 34929/79 "Registered" Postal Regi. No. WB/CC 113

বিজ্ঞান দরবারের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

গত 31শে অক্টোবর, 1লা নভেম্বর '81 কাঁচরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান দরবারের প্রথম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মডেল ও পোস্টার প্রদর্শনী, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ দিলীপ দত্ত ও দ্বিতীয় দিন শ্রীপ্রাণগোপাল সোম। 31শে অক্টোবর সকালে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় একটি বিজ্ঞান মিছিল দিয়ে। ধ্বংসের কাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা চলবে না; শিল্পের আবর্জনা ফেলে গঙ্গার জল দূষিত করা চলবে না; কুসংস্কার দূর করুন, বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তুলুন; পরিবেশকে নির্মল রাখুন, সুস্থ রাখুন; প্রতিবন্ধী বর্ষে শপথ নিন, আই ব্যাঙ্কে চোখ দিনও ইত্যাদি শ্লোগানে সারা শহর মুখরিত হয়ে উঠে। ডঃ তারক মোহন দাস এবং শ্রীসৌমেন গুহ যথাক্রমে পরিবেশ দূষণ এবং পশ্চিমবঙ্গের বন্যার উপর স্লাইডসহ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। এছাড়াও বিজ্ঞান চেতনার বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তৃতা দেন ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া সায়েন্স ক্লাব এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীমণি দাশগুপ্ত এবং ডঃ দীপঙ্কর রায়। বিজ্ঞান সাংবাদিক শ্রীযুগলকান্তি রায় সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসহকারে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন এবং ওগুলিকে দূর করার আহ্বান জানান। কাঁচরাপাড়ার পৌরপতি শ্রীঅমূল্য উকিল মহাশয় তাঁর ভাষণে বিজ্ঞান দরবারকে এই বলে আশ্বাস দেন যে তিনি উক্ত সংস্থার স্থায়ী কার্যালয়ের জন্য এক খণ্ড জমি দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় গান্ধীমোড়ে একটি বিজ্ঞান পথসভার মাধ্যমে। সভায় বিজ্ঞান-চেতনা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন শ্রীস্বপন কুমার শীল, অধ্যাপক ডঃ মণীন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ও কাঁচরাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅসীম ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার আলোচনাচক্র ঃ

ডি. ডি. কোসম্বী ঃ বিজ্ঞানী-ঐতিহাসিক

গত ২৮শে নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যাদবপুর সায়েন্স ক্লাব ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বীর জীবন ও কাজ সম্পর্কে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু। শ্রীস্বপন সোম, অধ্যাপক অমলেন্দু গুহ ও শ্রীসৌমেন গুহ কোসম্বীর বহুমুখী প্রতিভার এবং বিশেষ করে গণিত, ইতিহাস ও সামাজিক বিষয়গুলির উপর তাঁর কাজের পর্যালোচনা করেন।

বর্ধমানে সারা ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন

গত ডিসেম্বরের 29, 30 আর 31 তারিখে বর্ধমানের কাটোয়ায় 'সারা ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হলো। কলেজের পাশেই স্কুল প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিলো—'গোপাল ভট্টাচার্য নগর'। দুপুর দুটো থেকে খোলা হতো। বিভিন্ন মডেল ইত্যাদির প্রকর্শনী—'মেঘনাদ প্রদর্শনী'। সকাল নটা থেকে সম্মেলন কক্ষে শুরু হতো 'পূর্ব ভারত বিজ্ঞান ক্লাব সমিতি' (EISCA)-এর গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে সভা—মাঝে বিরতি বা বিজ্ঞানালোচনা। খোলা মাঠে ছিলো সংস্কৃতি মঞ্চ সাজানো - সাধারণ দর্শকের জন্য। আর তারই পাশে খোলামেলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আসর। বিকেলের পর থেকে জনাকীর্ণ মেলার চেহারা দেখা যেতো। আশে পাশে ছড়িয়ে ছিলো অসংখ্য খাবারের পসরা নিয়ে দোকানগুলো। সব মিলিয়ে বিরাট আয়োজন। আতিথ্যে কাটোয়ার বিজ্ঞান পরিষদ বহু স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে নেমেছে প্রায় আঠারো হাজার টাকার খরচ করে—

—দশ হাজার টাকা কাটোয়ার বাসিন্দাদের অবদান। নিমন্ত্রিত হয়েছে প্রায় পাঁচশ ক্লাব, এসেছে পঞ্চান্নটি। প্রায় 185 জন প্রতিনিধির মধ্যে ছিলো আসাম, বাংলাদেশ ও মণিপুরের বিজ্ঞান ক্লাব।

সাংগঠনিক দীর্ঘ আলোচনায় বহু সময় রীতিমত উত্তাপ ছিলো—বিশেষত আসাম ও মণিপুরের প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ দেখা গেলো। এদের ধারণা ছিলো ভারতের অন্যান্য প্রদেশ প্রতিনিধি পাঠাবে সম্মেলনে। তা ছাড়া বাংলা ভাষা বোঝার অসুবিধা। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি ক্লাবও ক্ষুব্ধ নানা কারণে। প্রদর্শনীর মডেলগুলো অতিরিক্ত গতানুগতিক। যথানিয়মে NCC-র মডেল এরোপ্লেন উড়তে দেখে লোকেরা তাজ্জব হয়েছে, 'মানুষের বিবর্তন' সম্পর্কে স্লাইড-বক্তৃতা নির্বাক হয়ে শুনেছে অনেকে। এতো কিছুর মধ্যে বলতে হবেই—সাধারণ মানুষ কিন্তু ভীষণ আগ্রহী এসব জানতে দেখতে।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে পার্থ সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও রবীন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রাকর প্রেসের পক্ষে রূপলেখা ২২ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।